দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

৭ নভেম্বর - ২০১১, ২০ কার্তিক - ১৪১৮ ।। ৬৪ বর্ষ, ১০ সংখ্যা

গোরক্ষপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠক

ভারতে পরিত্যক্ত শিশু দত্তক নেওয়ার আইনী অজ্ঞতা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

জন্মদিনেও উপেক্ষিতই থেকে গেলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ❑ ৮

মাওবাদীরা এখন স্রষ্টা সি পি এমের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে ❑ ৯

পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে ধরে-বেঁধে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে কে? ❑ উপানন্দ ব্রহ্মচারী ❑ ১১

জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা নীতি চাই : আর এস এস ❑ ১৩

পরিত্যক্ত শিশু অথবা টাকার থলি ❑ অনিন্দ্যকান্তি সিংহ ❑ ১৫

ভারতে শিশুকন্যা দত্তক নেওয়া বেড়েছে ❑ ১৭

দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলের বিরুদ্ধে জনগণের অনাস্থা : চার রাজ্যে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑ ১৯

মালদার শান্তিপূর্ণ এলাকাতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে ❑ ২০

মালদার পুজো নিয়ে প্রশাসনের বৈষম্যে মানুষের ক্ষোভ ❑ ২০

খোলা চিঠি : সবার উপরে দিদি সত্য, তাহার উপরে নাই ❑ ২১

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির, পর্ব - ৪ ❑ ডঃ প্রণব রায় ❑ ২৪

সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় নাট্যমহোৎসব হয়ে গেল কলকাতায় ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ অন্যরকম : ১৮ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ ভাবনা-চিন্তা : ২৩ ❑ পুস্তক প্রসঙ্গ : ২৫ ❑ নবাঙ্কুর : ২৭ ❑ কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা : ২৮ ❑ সমাবেশ-সমাচার : ২৯ ❑ শব্দরূপ : ৩২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পরিত্যক্ত শিশু অথবা টাকার থলি
পৃঃ ১৫ — ১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২০ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৭ নভেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

হিন্দু জাতীয়তার জাগ্রত কণ্ঠস্বর

বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন, পড়ান ও গ্রাহক হোন

প্রতি সোমবার প্রকাশিত হয়

মূল্য পাঁচ টাকা।। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২৫০.০০ টাকা।।

২৭/১ বি, বিধান সরণি, কলকাতা —৬, ফোন : (০৩৩)২২৪১-০৬০৩

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিকে সংস্কৃত আবশ্যিক নয় কেন?

রাজ্যের নূতন সরকার স্কুল শিক্ষার পাঠক্রমে আবার তৃতীয় ভাষাকে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছে। এই তৃতীয় ভাষার মধ্যে থাকিবে সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাগুলি। যাহার যাহা পছন্দ সে তাহাই পড়িতে পারিবে। তবে এই তৃতীয় ভাষাটি হইবে ঐচ্ছিক। পরীক্ষায় তাহার নম্বর যোগ হইবে না। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালের ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত আবশ্যিক পাঠ্য ছিল। সেই সময়ের বামফ্রন্ট সরকারের আদেশে সংস্কৃত আবশ্যিক হইতে ঐচ্ছিক বিষয় হইয়া যায়। তৃণমূল সরকার বামফ্রন্ট আমলের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করিতেছে কেন তাহা বোধগম্য নয়। রাজ্যের মানুষের দাবি হইতেছে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে সংস্কৃতের প্রত্যাবর্তন। কারণ এখনও বাঙালি সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আদি-প্রতিমা সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন। এমনকী আধুনিক বিজ্ঞানীরাও যে কোনও বিষয়ে উপযুক্ত পরিভাষা সংস্কৃত হইতেই আহরণ করিতে পারেন। মননশীলতার মানসিক পরিশীলনের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত শব্দ মূল্যবান উপাদান হইতে পারে। বাংলার শব্দ-সম্পদ সৃষ্টির প্রধানতম উৎস হইতেছে সংস্কৃত শব্দমূল। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে ভিন্নতার দেওয়াল তুলিতে যাওয়ার অর্থ হইবে শব্দ-সম্পদ সৃষ্টির এই স্বাভাবিক উৎসকে অস্বীকার করা। যে ছেলে-মেয়েরা সংস্কৃত ভাষার উপক্রমণিকা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা বাংলাভাষা চর্চার আসরে বসিতেই পারেন না। মাধ্যমিক পাঠক্রমে বহু বিষয়পাঠ আবশ্যিক রহিয়াছে। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়া নেহাতই জ্ঞান চর্চা হয়। ভূগোল শিখিয়া পরবর্তী জীবনে অল্প কয়েকজনেরই তাহা কাজে লাগিবে। তবু সকল ছাত্রকে ভূগোল পড়িতে বাধ্য করা হয়। তেমনি সংস্কৃত শিখিয়া না হয় কম ছাত্রের পরবর্তী জীবনে তাহা কাজে লাগিবে। এই যুক্তিতে মাধ্যমিকে ভূগোল আবশ্যিক হইলে সংস্কৃতই বা আবশ্যিক পাঠ্য হইবে না কেন? সংস্কৃতই একমাত্র ভাষা যাহা সমগ্র ভারতের মানুষ চর্চা করিয়া আসিতেছে বছরের পর বছর ধরিয়া। সংস্কৃতই ভারতীয় সংস্কৃতির আধার। সংস্কৃত ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানলাভ অসম্ভব। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সম্পদ, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া গড়িয়া ওঠা এদেশের সুবিশাল সাহিত্যকীর্তি যা সংস্কৃতে শাস্ত্ররাশিতে বিধৃত রহিয়াছে— তাহাকে ছাড়া এদেশের মূলে, গভীরে প্রবেশ করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে। এই দেশের সমাজ ব্যবস্থার উৎস জানিতে গেলেও সংস্কৃত জানা প্রয়োজন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত শ্রদ্ধা জানাইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সংস্কৃত ভাষার উন্নয়নের জন্য এখনও কোনও প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নাই। বরঞ্চ আমরা দেখিতেছি দিন দিন উর্দুর আধিপত্য কীভাবে বাড়িতেছে। অথচ প্রতিবেশী বাংলাদেশে বাংলা-ই হইল রাষ্ট্র ভাষা। কিন্তু সেই দেশের মননশীল বিদগ্ধজনেরাও সংস্কৃত হইতেই অধুনা শব্দ আহরণে ব্রতী। বঙ্গভাষার উন্নয়নের জন্য সেই দেশে পূর্বেই গঠিত হইয়াছে সংস্কৃত উন্নয়ন পর্ষদ। কিন্তু আমাদের রাজ্যে উর্দু আকাদেমি গঠিত হইলেও সংস্কৃত আকাদেমি নৈব নৈব চ! অন্য অনেক প্রসঙ্গ বাদ দিয়াও কেবল বঙ্গভাষার উন্নয়নের জন্য স্কুলস্তরে সংস্কৃতের আবশ্যিক প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন। তাই বহু পূর্বেই ড. অশোক মিত্র কমিশন বাংলার ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর সংস্কৃতের জন্য বরাদ্দ করিতে বলিয়াছিলেন।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ইংরেজ যখন একদা সমস্ত চীনদেশের কণ্ঠের মধ্যে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আফিমের গোলা ঠেসে দিয়ে তাদের আরাধ্য দেবতা-কে চিরদিনের মতো অপমানিত করলে, তখন এ পাপ থেকে অন্তত তারা বৈষয়িক পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু কল্পনা কর, দক্ষিণ চীন যদি রাগের মাথায় উত্তর চীনের মুখে বিষ ঢালতে থাকত, তাতে চীনের যে মৃত্যুর সঞ্চার হোত, তাতে দক্ষিণ তার থেকে নিষ্কৃতি পেত না। আত্মীয়দের শত্রুতা স্থলে জিতলেও মৃত্যু, হারলেও মৃত্যু। আমাদের মধ্যে যে কোনও সম্প্রদায় উগ্র উৎসাহে স্বজাতিক সত্তার মূলে যদি কুঠার চালায়, তবে নিজে উচ্চ শাখায় নিরাপদে আছে মনে করে খুশি হওয়াটা অধিক দিন টেঁকে না। দুঃখ এই, এই সব কথা দুঃখের দিনেই কানে সহজে পৌঁছোয় না। যখন মানুষের রিপু যে কোনও কারণেই উত্তেজিত হয়, তখন আত্মীয়কে আঘাতের দ্বারা মানুষ আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইতিহাসে শোচনীয়তম ঘটনা যা ঘটে, তা এমনি করেই ঘটে। মরবার বুদ্ধি পেয়ে বসলে মানুষ আপনিই মরবে জেনেও অন্যকে মারে। আমাদের সাধনা আজ কঠিন হয়ে উঠল। আজ অসহ্য আঘাতেও আত্মসংবরণ করতে যদি না পারি, তবে আমাদের তরফেও আত্মহত্যার আয়োজন করা হবে, শত্রুগ্রহের হবে জয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলজিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর সোলজারিটির অভিমত

কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদ 'লাভজনক' ব্যবসায় পরিণত করেছে জেহাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু-কাশ্মীরে জেহাদী হামলার সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে 'দস্যু' ও 'অপরাধী'রা যথেচ্ছ মাত্রায় ধর্ষণ, খুন, ছিনতাই, রাহাজানি ও অন্যান্য মাফিয়া কার্যকলাপ সংঘটিত করছে এবং এই অশান্ত অবস্থার দায় শেষপর্যন্ত নিরাপত্তাবাহিনী'র ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এবছর গরমকালে জম্মু-কাশ্মীরে সরেজমিনে ঘুরে দেখে এমন অভিমত-ই পোষণ করেছেন বেলজিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর সোলজারিটি উইথ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের প্রতিনিধিদল। তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে লিখেছেন, ''দস্যু ও অপরাধীরা, 'জেহাদে'র নামে জম্মু-কাশ্মীরে সাধারণ মানুষের ওপর খুন, জখম, ছিনতাই, রাহাজানি, ধর্ষণ প্রভৃতি মাফিয়া কার্যকলাপ চালিয়ে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। জেহাদীদের কাছে এটি এখন একটি 'লাভজনক' ব্যবসা এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা খুবই সহজ যে তাদের অপরাধের যাবতীয় দায়ভার নিরাপত্তারক্ষীদের কাঁধে চাপিয়ে এব্যাপারে নিরাপত্তারক্ষীদেরকেই অপরাধী হিসেবে জনসমক্ষে সাব্যস্ত করা।" প্রসঙ্গত, গত গ্রীষ্মে জম্মু-কাশ্মীর ঘুরে দেখার সময় পল বিরসম্যানসের নেতৃত্বাধীন ওই ইউরোপীয় থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সৈয়দ আলি শাহ গিলানী, বিলাল লোন, আবদুল গনি ভাটের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জেহাদী গোষ্ঠীকে মদতদানকারী নেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী করে 'অন্ধের' মতো নিরাপত্তারক্ষীদেরই এব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছে তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বেলজিয়ামের ওই সংস্থাটির পরিদর্শকদল।

এদেশীয় রাজনীতির কারবারিরা যেভাবে তোষণ রাজনীতির স্বার্থে ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর 'মানবাধিকার লঙ্ঘনে'র অভিযোগ হেনে জেহাদীদের উৎসাহিত করছিল, বেলজিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের এই রিপোর্ট তার যোগ্য জবাব বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অনুমান। অন্যদিকে এই জেহাদ যে 'আদর্শগত' নয়, 'সুবিধাবাদী' তা-ও জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে গেল বলে নিরাপত্তা-বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সিপিএমের ডানা ছাঁটতে মরিয়া শরিকরা

বিশেষ প্রতিবেদন।। ফ্রন্টের মধ্যে নানা-বিতর্ক এবং প্রতিটি পার্টির মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা যাচ্ছে। আর এস পি, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপিএমের দ্বিদলীয় আলোচনাতে সিপিএম-নেতৃত্ব বিপর্যস্ত। লক্ষণীয় সিপিএমের সঙ্গে দ্বিদলীয় আলোচনার পূর্বে আর এস পি, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা বসে ঠিক করেছিলেন কোন কোন বিষয়ে সিপিএম-নেতৃত্বকে তুলোধোনা করতে হবে। সে বিষয়গুলি হলো— (১) নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য সিপিএম এককভাবেই দায়ী (২) বামফ্রন্টকে অচল করে দিয়ে সিপিএম নিজেদের সিদ্ধান্ত বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত হিসাবে চালিয়েছিল। (৩) বামফ্রন্টের দলগুলিকে দাবিয়ে রাখা। (৪) বামফ্রন্টের কোনও কোনও নেতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমালোচনা। (৫) সিপিআই (এম-এল) ও এস ইউ সি-কে বামফ্রন্টে এনে বামফ্রন্টের বিস্তার ঘটানো। (৬) সিপিএম-এর দাদাগিরি চল্‌বে না। (৭) বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ফরওয়ার্ড ব্লকের মহীরুহ নেতা অশোক ঘোষ-কে করতে হবে। এবং বামফ্রন্টের যুগ্ম আহ্বায়ক হবে সিপিআই ও সিপিএম।

উল্লেখ্য, প্রতিটি দ্বিদলীয় সভায় প্রতিটি পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেছেন চার-পাঁচজন। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে— প্রতিটি পার্টিতেই নেতৃত্বের মধ্যে রেষারেষি রয়েছে। এ-ব্যাপারে সিপিএমের অবস্থা আরও সঙ্গীন। বামফ্রন্টের সভায় ফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং প্রাক্তন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এর অতিরিক্তে উপস্থিত ছিলেন মদন ঘোষ, বিনয় কোঙার। উল্লেখ করার বিষয় হলো— রবীন দেব, নিরুপম সেন ও শ্যামল চক্রবর্তী অনুপস্থিত ছিলেন।

সিপিএমের প্রতিটি জেলায় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা হচ্ছে। নেতৃত্ব দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। এখন কলকাতা জেলার সম্পাদক হবার জন্য রাজদেও গোয়ালা তৈরি হচ্ছেন। তিনি জেলা-সম্পাদকমণ্ডলীর ডি-ফ্যাকটো সদস্য অমল চ্যাটার্জি-কে নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছেন। উত্তর কলকাতার বসে যাওয়া কমরেডদের বক্তব্য হলো— ''রাজ্য-নেতৃত্ব জানা সত্ত্বেও রাজদেও গোয়ালার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগে কর্ণপাত করেন না।" এখানেও রবীন দেব একা। উল্লেখ করা প্রয়োজন অলোক মজুমদারকে পার্টিতে ফিরিয়ে এনে পূর্বতন পদে আসীন করা হয়েছে। তিনিও জেলা সম্পাদক হবার জন্য বরাবরই লালায়িত।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন। — ব্যবস্থাপক

জাত-পাত ভিত্তিক ভোট না করার দাবিতে আর এস এসের পাশে শিয়া সম্প্রদায়ও

সুদর্শনজীর (বাঁ দিকে) সঙ্গে সাদিক।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়তে চলেছে রাজনীতির কারবারিদের। যাদের রাজনীতি'র মূলধন-ই হলো জাত-পাতভিত্তিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু-ধর্মকে বহুধাবিভক্ত করে ভোটের ময়দানে ফায়দা লোটা এবং তথাকথিত সংখ্যালঘুদের জন্য তোষণ- রাজনীতির মাধ্যমে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো। এই ভোট-লুটেরাদের সেগুড়ে বালি দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহুদিনের জাত-পাতভিত্তিক ভোট না করার দাবিতে নিঃশর্ত সমর্থন জানাল শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়। ওই দাবি নিয়ে গত ৩০ অক্টোবর আর এস এসের প্রাক্তন সরসঙ্ঘচালক কুপ্পহলি সীতারামাইয়া সুদর্শন উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ-এ ইউনিটি কলেজে সাক্ষাৎ করেন শিয়া ধর্মযাজক মৌলনা কালবে সাদিকের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎকারের শেষে শ্রী সুদর্শনের সঙ্গে সাদিক যৌথ বিবৃতি-তে জাত ও বর্ণ নির্বিশেষে ভোট দেওয়ার জন্য ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী-র কাছে আবেদন জানান। কংগ্রেসীদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে, মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি-র মতো বিষয়কে জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতি-র থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়ে সঙ্ঘের সুরে সুর মিলিয়েই সাদিক বর্তমান ওই বিষয়গুলিকে দেশের সামনে বৃহত্তম সমস্যা হিসেবে অভিহিত করেন যৌথ বিবৃতিতে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যরত তিলক রঞ্জন বেরা, পাশে শক্তিশেখর দাস।

চীনা পণ্য বর্জনের ডাক আর এস এসের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের আগ্রাসী নীতিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কড়া ভাষায় নিন্দা করে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। গত ১৪-১৬ অক্টোবর গোরক্ষপুরে এই বিষয়ে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠকে প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এরপর গত ২১ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ডঃ তিলকরঞ্জন বেরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতার ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কেশবভবন-এ চীনের আগ্রাসন এবং চীনা ভোগ্যপণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে সাবধান করে দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বরাবর জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে দেশ তথা দেশবাসীকে সাবধান করে আসছে। তবে চীনা 'পণ্য বয়কট' এর ডাক নয়, স্বাভাবিক দেশাত্মবোধের ভিত্তিতেই চীনা পণ্য বর্জন করা উচিত বলে ডঃ বেরা জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ শক্তিশেখর দাস এবং অন্যান্য প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৫.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২৫০.০০ টাকা

স্বস্তিকা দীপাবলী সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৮ অক্টোবর লোকমাতা নিবেদিতার জন্মদিনে স্বস্তিকার দীপাবলী সংখ্যা আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ মনমোহন বৈদ্য। সকালে কলকাতার কেশবভবনে সঙ্ঘস্থানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী, স্বস্তিকার প্রবীণ ট্রাস্টী অমল কুমার বসু ও কেশবরাও দীক্ষিত, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উপদেষ্টা বসন্তরাও ভট্ট, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর গুরুশরণজী সহ উপস্থিত সুধীজন। ভগিনী নিবেদিতার সাধনাময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ কার্যকারিণীর সদস্য রাধাগোবিন্দ পোদ্দার। ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষকে স্মরণে রেখে দীপাবলী সংখ্যাটি লোকমাতা নিবেদিতাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে স্বস্তিকা সমর্পণ করেছে বলে জানান পত্রিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য। তিনি শ্রীবৈদ্যর হাতে দীপাবলী সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য তুলে দেন। সব মিলিয়ে স্বল্প সময়ের সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানটি মনে একটা দাগ রেখে যায়।

স্বস্তিকা দীপাবলী সংখ্যা হাতে মনমোহন বৈদ্য।

জন্মদিনেও উপেক্ষিতই থেকে গেলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

গূঢ়পুরুষের

কলম

হ্যাঁ, নিঃশব্দেই পার হয়ে গেল ৩১ অক্টোবর ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনটি। একমাত্র গুজরাট ছাড়া দেশের দ্বিতীয় কোনও রাজ্যে— সরকারিভাবে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছে এমন সংবাদ খবরের কাগজে পড়িনি। টিভি চ্যানেলেও কোনও অনুষ্ঠান দেখিনি। অথচ ভারতের স্বাধীনতা, অখণ্ডতার জন্য সর্দার প্যাটেলের অবদান ভোলা যায় না। তিনি চাইলে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। নেহরু নয়। দেশের অধিকাংশ রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনই সর্দার প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসাতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের দুই মুসলমান নেতা রফি আহমেদ কিদোয়াই ও মৌলানা আজাদকে খুশি করতে গান্ধীজীর নির্দেশে সর্দার সরে দাঁড়ান। মুসলিম স্বার্থরক্ষায় জওহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়।

কথাটা আমার নয়। সর্দার প্যাটেলের কন্যা মণিবেন প্যাটেল তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এমনই কথা লিখে রেখে গেছেন। মণিবেন ছিলেন তাঁর পিতার ছায়াসঙ্গিনী। প্যাটেলের একান্ত সচিব। সর্দার তাঁর মনের কথা অকপটে বলতেন একমাত্র মণিবেনকে। ১৯০৯ সালে সর্দার প্যাটেলের পত্নী বিয়োগ হয়। মণিবেনই তাঁর অবলম্বন ছিল। সম্প্রতি মণিবেনের ব্যক্তিগত ডায়েরিটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম, 'ইনসাইড স্টোরি অফ সর্দার প্যাটেল : ডায়েরি অফ মণিবেন প্যাটেল— ১৯৩৬-৫০'। প্রায় ৫২৩ পাতার বইটিতে মণিবেনের ডায়েরির সবটাই পাওয়া যায়। কীভাবে জওহরলাল নেহরু প্রতি পদে প্যাটেলের কাজে বাধা দিয়েছিলেন, তার খুঁটিনাটি বিবরণ মণিবেন লিখেছেন তাঁর ডায়েরিতে। মণিবেন হয়তো ভাবেননি তাঁর ডায়েরি ছাপার অক্ষরে কোনওদিন প্রকাশিত হবে। ভাবলে অতটা খোলাখুলিভাবে নেহরু-প্যাটেল লড়াইয়ের গোপন তথ্য নিয়ে রাখতেন না। হ্যাঁ, মণিবেন কোনওরকম গোপনীয়তা না রেখেই লিখেছেন কীভাবে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়কে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে নেহরু কিদোয়াই গোষ্ঠীকে মদত দিয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন সর্দার প্যাটেল। পাকিস্তানি হানাদারদের হঠিয়ে দিয়ে পুরো কাশ্মীরকেই ভারতভুক্ত করতে চেয়েছিলেন সর্দার প্যাটেল। নেহরুর ষড়যন্ত্রে পারেননি। সেদিন তাঁর হতাশা, ক্রোধ ব্যক্ত করেছিলেন একমাত্র তাঁর কন্যা মণিবেনের কাছে। লালচীন ভবিষ্যতে ভারতের বিপদের কারণ হবে বলে নেহরুকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন ভুটানের মতোই তিব্বত ও নেপালের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেশের স্বার্থেই ভারতের নেওয়া উচিত। নেহরু শোনেননি। কারণ, তিনি সর্দার প্যাটেলকে ঘৃণা করতেন। ভয় পেতেন কংগ্রেস সংগঠনে সর্দারের প্রবল

সমর্থনকে। নেহরুর আশঙ্কা ছিল তাঁর প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিটি হয়তো প্যাটেল দখল করে নিতে পারেন। এই ঘৃণা ও আশঙ্কা থেকেই জন্ম নিয়েছিল প্যাটেলের প্রতি নেহরুর বৈরিতা।

মণিবেন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন যে কংগ্রেস দলে রফি আহমেদ কিদোয়াই ও মৌলানা আজাদ ছিলেন চরম হিন্দু বিদ্বেষী। প্যাটেল যেভাবে ভারতের মুসলমান নবাবদের ছোট ছোট রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন তাতে বিস্তর চটেন তাঁরা। কংগ্রেসের এই দুই মুসলমান নেতার প্ররোচনায় কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণায় প্যাটেলকে বাধ্য করেন নেহরু। কিদোয়াই বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লেও নেহরু কোনওরকম তদন্ত করতে রাজি হননি। কিদোয়াই নেহরুর কোনও গোপন পাপের কথা জানতেন। তাই তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন, ''আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সব ফাঁস করে দেব।'' মণিবেন ডায়েরিতে লিখেছেন যে তাঁর পিতা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। বলতেন, 'রফি ব্ল্যাকমেল করছে'। কংগ্রেস সংগঠনে হিন্দু নেতারা প্রায় সকলেই সর্দার প্যাটেলের অনুগত ছিলেন। নেহরু তাই অন্ধের মতো কিদোয়াই এবং আজাদের হাত ধরে মুসলমান সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েই।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের রাজনৈতিক জীবনের নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ হয়নি। কারণ, নেহরু পরিবার চায়নি যে প্যাটেলকে উচ্চাসনে বসানো হোক। আজও তাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তী পালিত হয় না। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সর্দার প্যাটেল অজানাই থেকে গেছে। আজ দেশের প্রবীণ কিছু মানুষ মনে রেখেছেন ১৮৭৫ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাটে সর্দারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জাভেরভাই ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সৈনিক ছিলেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে রাণীর সঙ্গে মরণপণ লড়ে ছিলেন। তাঁকে সর্দার বলে ডাকতেন গান্ধীজী। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তাঁর দৃঢ়তার জন্য দেশবাসী তাঁকে 'লৌহ মানব' বলে একদা সম্মানিত করেছিল।

আত্মবিস্মৃত দেশবাসী আজ সেই লৌহ মানবকে ভুলে গেছে।

মাওবাদীরা এখন স্রষ্টা সিপিএমের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে

নিশাকর সোম

মাওবাদী তথা নকশাল আন্দোলনের সৃষ্টিকর্তা হলো সিপিএম। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে রুশপন্থী এবং চীনাপন্থী বলে বিভাজন করে সকল সংবাদপত্রে লেখা হোত। কেননা তখন এক গোষ্ঠী রুশ কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্ধ অনুসরণ করতো। এই ঘটনার এক খোলামেলা বক্তব্য পাওয়া গিয়েছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এস এ ডাঙ্গের উক্তিতে। তিনি বলেছিলেন, ''রুবল (রুশ মুদ্রা) আসুক বেগে— সেটাই মার্কিন ডলারকে তাড়িয়ে দেবে বেগে।''

অপরগোষ্ঠী অর্থাৎ চীনা কমিউনিস্ট বক্তব্যকে অন্ধ-অনুসরণ করে সমগ্র পার্টিতে আলোড়ন তোলেন হরেকৃষ্ণ কোঙার, সুন্দরাইয়া প্রমুখ। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য ছিল— 'ক্রুশ্চেভ-এর পার্টি মেকি (ফানি) কমিউনিজম। রুশ কমিউনিস্ট পার্টি আধিপত্যবাদ চালায়। এর ফল সিপিএম নেতারা হাতে হাতে পান— নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন ঘুরে গিয়ে সিপিআই (এম এল) তৈরি করে। নতুন পার্টির নেতারা বলতে থাকেন, ''চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান; বন্দুকের নলই হচ্ছে শক্তির উৎস, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙছি, মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি বসাচ্ছি।'' বিদ্যাসাগর নাকি সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন! স্মরণীয়, ১৯৬৯ সালে বর্ধমানের প্লেনামে নাগি রেড্ডি-পোলা রেড্ডি গোষ্ঠীর প্রসঙ্গে বিতর্ক করে সিপিএম চীনের বহু কথার বিরোধিতা করে আদর্শগত দলিল গ্রহণ করে। অন্ধ্রের নেতৃদ্বয় নাগি রেড্ডি এবং পোলা রেড্ডি পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরি করেন। সিপিএম তখনও রাজনৈতিকভাবে মাওবাদী-নকশাল-চারু মজুমদার নীতির বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক' সংগ্রাম করার কথা বলেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলেই নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে দেখা গেলো জনযুদ্ধ গোষ্ঠীদের সাহায্য নিতে কমিউনিস্ট (সিপিএম) এবং কংগ্রেস উৎসুক। যদিও এই চরমপন্থীরা পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলেছিলেন। তথাপি কোনও না কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নির্বাচনে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। অন্ধ্রে তো সীতারামাইয়া গোষ্ঠী চন্দ্রবাবু নাইডু-র বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সাহায্য করেছিলেন বলে খবর। প্রাক্তন এক নকশাল নেতা তাঁর নিবন্ধে একথা লিখেছেন। সিপিএমও নকশালগোষ্ঠীর সাহায্য বহুবার নিয়েছে।

যা হোক, সাম্প্রতিককালে সিপিএমের পলিটব্যুরোতে আদর্শগত দলিল- এর খসড়া গৃহীত হয়েছে। সেই দলিল অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি তথা পার্টিকংগ্রেসে পেশ করা হবে। সেখানে মূল বিষয়গুলি হলো— (১) ভারতের নিজস্ব অবস্থা বিবেচনা করে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। (২) বিশ্বায়নের প্রতিফলন বিচার করে বিপ্লবের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। (৩) বিরোধীদল হিসাবেই পার্টিকে থাকতে হবে। কাজেই ইতিবাচক বিরোধিতায় যেতে হবে। (৪) পুঁজিপতিদের সম্পর্কে পুরানো ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করতে হবে।

আগেই এই কলামে লেখা হয়েছে যে সিপিএমে আজ আদর্শগত সংঘাত প্রবল। রাজ্যে বিমান বসু, নৃপেন চৌধুরী, মদন ঘোষ প্রমুখেরা একটা গোষ্ঠী করে আদর্শগত সংগ্রামের নামে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখ্‌তে চাইছেন। এদিকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিমান বসুকে মোটেই নেতৃত্বে রাখতে চাইছেন না। বুদ্ধবাবু তো নিজেই সরে যাবেন। তিনি পুস্তক অনুবাদ আর কিছু লেখালেখি নিয়েই থাকার মনস্থ করেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বিরোধী নেতা সূর্যকান্ত মিশ্রকে প্রায় একাই চলতে হচ্ছে।

এবার দেখা যাক, মাওবাদীদের সম্পর্কে নতুন রাজ্য সরকারের এবং মাওবাদীদের সেই সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামের জনসভায় মাওবাদীদের গুণ্ডা, ডাকাত, সুপারি কিলার বলে অভিহিত করে সাত দিনের মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করার আলটিমেটাম দিলেন। ঝাড়গ্রামের এই সভায় শুভেন্দু অধিকারী অনুপস্থিত ছিলেন। জেলবন্দি ছত্রধর মাহাতো যে চিঠি পাঠিয়েছেন সেটা উদ্ধৃত করছি : ''২০০৯ সালে হার্মাদবাহিনীর হাতে নিহতদের সভায় জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর পাশে দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জি নিহতদের শহীদ হিসাবে আখ্যা দেন। আপনি (মমতা) অগণিত জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, জঙ্গলমহলের হাজার হাজার মানুষ যদি মাওবাদী হয়, তবে আমিও মাওবাদী।

এখন যৌথবাহিনী-হার্মাদবাহিনীর তাণ্ডব অব্যাহত। আপনারা নতুন করে গৃহযুদ্ধ শুরু করলে জনগণ সাধ্যমতো প্রতিরোধ করবেই। মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আপনাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন।''

মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থেকে নির্বাচিত 'তৃণমূল' বিধায়ক আটের দশক থেকেই সিপিআই(এম-এল)-এর সঙ্গে যুক্ত। সন্তোষ রাণার দলের নেতা প্রদীপ ব্যানার্জির (প্রখ্যাত ফুটবলার মোহিনী ব্যানার্জির পুত্র) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। ৯৩ সাল থেকে দশ বছরের জন্য চূড়ামণিবাবু পঞ্চায়েতের মহাজোটের প্রধান ছিলেন। চূড়ামণিবাবুর বক্তব্য, ''ওরা (মাওবাদীরা) তো অস্ত্র সংবরণ করেছে। নতুন কোনও খুনের ঘটনা ঘটায়নি। তাই আমি মনে করি, আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বরং আলোচনা চলাকালীন যৌথবাহিনীর ব্যাপক তল্লাশি অভিযান কমানো দরকার।''

উল্লেখ করা যায়, চূড়ামণি নাকি মাওবাদীদের গোপন সভায় উপস্থিত থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী সাতদিনের জবাবে মাওবাদী নেতা কিষেণজি (যাঁকে কলকাতার বেসরকারি দূরদর্শন চ্যানেল এবং সংবাদপত্র ব্যাপক প্রচার দিয়েছিল) বলেছেন--- 'মুখ্যমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ-এর পর আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেছে'।

রাজ্য সরকার নতুন করে ২,০০০ জওয়ান চেয়েছে। রাজ্যপাল বলেছেন ''ওয়েল ডান''। ঝাড়গ্রামের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''তাঁর দলীয় নেতাদের উপর হামলা হলে জনগণ বুঝে নেবে।'' দু' মাসের যৌথবাহিনী টহল বন্ধ হওয়ার দরুণ মাওবাদীরা ঘর গুছিয়ে নিয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর।

রাজনৈতিকভাবে মাওবাদীর সৃষ্টিকর্তা সিপিএম। নির্বাচনী সাফল্য পাবার জন্য কমিউনিস্ট-কংগ্রেস-তৃণমূল এদের সাহায্য নিয়েছে। এখন সিপিএম বর্তমান রাজ্যসরকার-এর যৌথবাহিনীর অভিযান সমর্থন করছে। মাওবাদীদের প্রশ্নে সিপিএম-তৃণমূল একই সুরে গাইছে।

খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতি ১১.৫ শতাংশে

১৫ অক্টোবর শেষ হওয়া সপ্তাহে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির হার পৌঁছলো ১১.৪৩ শতাংশে, যা গত ছ'মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স (ডব্লিউ পি আই) অনুযায়ী নির্ধারিত এই খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির হার তার আগের সপ্তাহে ছিল ১০.৬০ শতাংশ। এই মাগ্গীগণ্ডার বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম এমনিতেই চড়া, তায় উৎসবের মরসুম, সুতরাং খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ মানুষকে যে কতটা বিপদে ফেলেছিল তা সহজেই অনুমেয়। অর্থনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির হাল দেখে (মূলত ওয়াল স্ট্রীট) আশঙ্কা করছেন, গত বছরে ১৪.২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়া হারকে অচিরেই ছুঁয়ে ফেলতে পারে সাম্প্রতিকতম খাদ্য-মুদ্রাস্ফীতির হার।

ভাড়া বাকি ৬৩ লক্ষ

এক-আধ টাকা নয়, সবশুদ্ধ ৬৩ লক্ষেরও বেশি টাকা; ভাড়া হিসেবে বাকি পড়েছে সাত তাবড় রাজনীতিকের। জগদীশ টাইটেলার, জি বেঙ্কটস্বামী, জগমোহন রেড্ডী সহ ওই সাত রাজনীতিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য জানার অধিকার আইনে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ জি বেঙ্কটস্বামীর ২৯.৪ লক্ষ টাকা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী জগদীশ টাইটেলারের ১৯.১ লক্ষ টাকা, কাদাপা-র সাংসদ জগনমোহন রেড্ডির ৩ লক্ষের বেশি টাকা বাকি রয়ে গেছে সরকারি ফ্ল্যাট বা বাংলো ভাড়া বাবদ। কবে এই টাকা উদ্ধার হবে তা দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্য!

১০,০০০ পরিযায়ী পাখি

ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া জেলার বিখ্যাত ভিতরকণিকা জাতীয় পার্কে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। সরকারি সূত্রের খবর, এই পরিযায়ী পাখিদের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১০,০০০ পেরিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন- আধিকারিক মনোজ মহাপাত্র জানিয়েছেন, গত দু'দিনে ব্রাহ্মণী হাঁস, রাজ হাঁস, পাতি হাঁস সহ সাইবেরিয়া এবং ইরাক থেকে বহু পরিযায়ী পাখি ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে। এভাবে বাড়তে বাড়তে আগামী ডিসেম্বরের শেষে পরিযায়ী পাখির এই সংখ্যাটা 'পিকে' উঠবে। গত কয়েক বছরের তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, সবমিলিয়ে পরিযায়ী পাখির সংখ্যাটা নেহাৎ লাখ খানেকের কম দাঁড়াবে না।

সেতু দুর্ঘটনা

দার্জিলিঙে বিজনবাড়ির পর এবার অরুণাচল প্রদেশের সেপ্পা। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে

উপর্যুপরি দু'দুটি মর্মান্তিক সেতু দুর্ঘটনা ঘটলো। অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেং জেলায় সেপ্পায় গত ২৯ অক্টোবর কামেং নদীর ওপর ভেঙে পড়ে একটি পরিত্যক্ত সেতু। এই দুর্ঘটনার সময় প্রায় একশ-র কাছাকাছি মানুষ সেতুতে অবস্থান করেছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। শেষ সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অর্ধশতাধিক মানুষের মৃত্যুর খবর জানা গিয়েছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, দীর্ঘদিন সেতুগুলোতে সংস্কার না হওয়ার জন্য তার স্থাপত্যে চিড় ধরেছে। তার ওপরে শ'খানেক মানুষ ওই সেতুগুলোতে জড় হলে, তার চাপ নেওয়া ওই ভঙ্গুর সেতুগুলোর পক্ষে দুর্বহ হয়ে উঠেছে বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে তাঁদের অভিমত।

দুর্নীতি দমনে সদিচ্ছা

দুর্নীতি দমনে তাদের সদিচ্ছার পরিচয় দিল বিজেপি পরিচালিত উত্তরাখণ্ড সরকার। গত ২৯ অক্টোবর জনলোকপাল বিলের খসড়া গ্রহণ করে শুধু দুর্নীতি দমনে বিজেপি-র সদিচ্ছা-ই নয়, একইসঙ্গে নিজেদের সততাকেও কষ্ঠিপাথরে সরকার বিচার করে নিল বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেও এই বিলের খসড়ায় উত্তরাখণ্ড সরকার নিয়ে আসায় স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে এর আওতায় নিয়ে আসতে কংগ্রেসের এত অনীহা কেন সে প্রশ্নও উঠে এসেছে। নিন্দুকেরা অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না— বিজেপি পরিচালিত উত্তরাখণ্ড সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সৎসাহস জনলোকপালে মুখ্যমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করেছে, সেই 'সৎ'সাহসের অভাব-ই জনলোকপালে প্রধানমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

১২০ বছরে দ্বিতীয় বিয়ে

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ৪ কন্যা, ২ পুত্র সহ ১২২ জন নাতি-নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে রীতিমতো আনন্দ-উল্লাসে ১২০ বছরের প্রৌঢ় হাজি আব্দুল নূর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। পাত্রী ত্রিপুরার উত্তর ফুলবাড়ি গ্রামের প্রয়াত মশদ আলির কন্যা হুমই বিবি (৭০)। উল্লেখ্য, পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত সাতঘরি গ্রামের হাজি আহমদ আলির পুত্র আব্দুল নূর। ২০০৫ সালে আব্দুল নূরের স্ত্রী মারা গেলে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। মনের কথা বুঝতে পেরে সারা অসম মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক আলহাজ আজিরউদ্দিন পাত্রীর সন্ধান চালাতে থাকেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পিতার পছন্দের পাত্রীও খুঁজে বের করেন আজিরউদ্দিন। পাত্রী খুঁজতে সহায়তা করেন ৪ বোন ও ছোট ভাই। ইসলাম ধর্মীয় রীতি মেনে রবিবার আছিমঞ্জ হানিফাবাদের নিজের বাড়িতে পাত্রী হাজি আব্দুল নূরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন হুমই বিবি। নিজের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি সহ প্রায় তিন শতাধিক কৌতূহলী জনতা বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন। প্রৌঢ় আব্দুল নূরের বড় মেয়ে জুবেদা খাতুন। সেই জুবেদা খাতুনের নাতনির সন্তান বর্তমানে নবম শ্রেণিতে পাঠরত। মানে, এই বিয়েতে সাক্ষী থাকল চার প্রজন্ম।

এ দিকে, এই বিবাহে ঘটকের ভূমিকায় ছিলেন ত্রিপুরা রাজনগরের আব্দুল হামিদ। মহাধুমধামে বিবাহের পার্টির জন্য বাজারের কেনাকাটার ব্যস্ত আব্দুল নূরের নাতি মাইসাফেল মুখপাত্র নজমূল ইসলাম জানালেন, বিয়ে পাঠ করান হানিফাবাদ জামে মসজিদের ইমান মৌলানা ফকর জামান। বিবাহ সংক্রান্ত মুসলিম শরিয়তি আইনের মাহাত্ম্যটা বুঝুন তবে!

পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে ধরে-বেঁধে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠাবে কে?

মিলনের হুজুগে সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। অনুপ্রবেশ সম্পর্কে এই উদাসীনতা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুকে শেষ করবে।

উপানন্দ ব্রহ্মচারী

''আবহাওয়া ছিল উৎসবের। কিন্তু প্রশাসনের গা ছাড়া মনোভাবের সুযোগ নিয়ে তা পরিণত হলো চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায়। অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে লুঠপাট, তোলাবাজি, চুরি-ছিনতাইয়ের অবাধ ক্ষেত্র হয়ে উঠল শুক্রবার (৬.১০.১১) উত্তর ২৪ পরগণার টাকিতে বিসর্জন উপলক্ষে দুই বাংলার মিলনোৎসব।

বি এস এফ, পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনেই ট্রলার বজরা, লঞ্চ, ভুটভুটি ও ছোট নৌকা বোঝাই করে এদিন ওপার থেকে আসা প্রচুর মানুষ ঢুকে পড়লেন এপারে। এপারে প্রচুর মানুষের ভিড়ের সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্যে রাস্তাতেই চলল মদের আসর। চলল লুঠপাট, চুরি-ছিনতাই। শ্লীলতাহানির শিকার হলেন অনেকে। এক সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিও চালাতে হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাঁরা শান্তিতে দুই বাংলা মিলনের উৎসব প্রত্যক্ষ করতে এসেছিলেন এমন পরিস্থিতিতে পড়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁরা। এমনকী অনেকের বিসর্জন দেখার ইচ্ছা থাকলেও ভয়ে ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশের এবং বি এস এফের এ হেন গাফিলতিতে ক্ষুব্ধ টাকির মানুষ দুই বাংলার মিলনের নামে এমন বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার দাবিও তুলেছেন। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাঁরা জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টা। টাকির ইছামতী নদীর বিভিন্ন ঘাটে তখন জমিদার বাড়ির প্রতিমা, বারোয়ারি প্রতিমা আনা হচ্ছে বিসর্জনের জন্য। ওপার থেকে মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, ''একটু পরেই দুই বাংলা মিলবে। এই মুহূর্তটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের, গর্বের। আনন্দে সামিল হোন আপনারা। ঘোষণা শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল ট্রলার, বজরা, লঞ্চ, ভুটভুটি ও ছোট নৌকা এদিকে আসতে শুরু করেছে। সবকটিতেই বোঝাই মানুষ। এ পারে ভিড়তেই হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়লেন তাঁরা। পরের পর মানুষ বোঝাই নৌকা। যেন বিরাম নেই। নদীতে যথারীতি টহল দিচ্ছে বাংলাদেশ রাইফেলস এবং বি এস এফের স্পীডবোট। দুই পারেই রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও পুলিশ। কিন্তু নজর রাখা ছাড়া আর কিছুই করছেন না তাঁরা। যে দিকে তাকানো যায় শুধুই মানুষ। প্রতিমা তেমন চোখে পড়ল না।

উৎসব উপলক্ষে ওপার থেকে নৌকাবোঝাই হয়ে আসা লোকজনের অনেকেই আর ফিরে যাবে না।

এই দৃশ্য টাকিতে নতুন নয়। প্রতি বছর পুজোয় বিসর্জনে এটাই দেখা যায়। তবে, এ বার যেন ছিল লাগামছাড়া। কেন এতটা উন্মুক্ত সীমান্ত?

প্রতিমা নিরঞ্জনের আনন্দে সামিল হয়েছিলেন ওপারের সাতক্ষীরা জেলায় দেভাটা, শাকদা, ভাতশালা গ্রামের করিম মোল্লা, লায়লা বিবি, খগেন মণ্ডল, মালবিকা মিস্ত্রীরা। তাঁদের কথায় প্রতিবারই এমনটা হয়। তবে এ বার মানুষ বেশি এসেছেন বিজয়ার আনন্দে সামিল হতে। তবে এই সামিল হওয়ার ধাক্কায় এ পারে পুরোপুরি ভেঙে পড়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো। ভিড়ের মধ্যে অবাধে চলতে থাকে চুরি-ছিনতাই, লুঠপাট। বিভিন্ন জায়গায় বসে যায় মদের আসর। শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ি ফিরে যান। যাঁরা পরে বেরোবেন ভেবেছিলেন, তাঁরাও সব শুনে আর বাড়ি থেকে না বেরোনোর সিদ্ধান্ত নেন।

টাকি নাগরিক কমিটির সম্পাদক এবং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ''দোকানে ঢুকে লুঠপাট, মারামারি করা হলো। যত্রতত্র নোংরা আবর্জনায় ভরে গেল। এই অত্যাচার সহ্য করা যায় না। পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। আর এরই সুযোগ নিয়ে মৈত্রীর নামে এ দেশে ঢুকে পড়ল হাজার হাজার মানুষ। এটা কখনও মেনে নেওয়া যায় না। এমনটা যাতে আর না ঘটে সে জন্য আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছি।''

টাকির পুরপ্রধান সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা চাই না প্রতিমা নিরঞ্জনের নামে এমন অনুপ্রবেশ ঘটুক। পুলিশ বি এস এফের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সীমা ছাড়ায়। বিষয়টি আমরা দিল্লিতে জানাব।''

এ ব্যাপারে বি এস এফের জনসংযোগ দফতরের (দক্ষিণবঙ্গ) এক আধিকারিক জানান, এ দিন নদীতে বি এস এফের যথারীতি টহলদারি ছিল। বিসর্জন দেখতে বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ ইছামতীতে নৌকা নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। এ পারে কেউ আসেননি। তবে অনুপ্রবেশের অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন বিষয়টি অবশ্য তদন্ত করে দেখা হবে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করে বসিরহাটের এস ডি পি ও আনন্দ সরকার বলেন, ''আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তবে অন্যবারের চেয়ে এবার বেশ ভিড় হয়েছিল। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে

সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।"

এই ছিল ৮ অক্টোবরের (২০১১) আনন্দবাজার পত্রিকার মোটামুটি নিরপেক্ষ প্রতিবেদন। শিরোনাম : ভিড়ের সুযোগ নিয়ে লুঠপাট-শ্লীলতাহানি, উঠল অনুপ্রবেশের অভিযোগও : টাকিতে বিসর্জনে বিশৃঙ্খলা নিয়ে অভিযুক্ত পুলিশ এবং বি এস এফ।

কিন্তু 'আর এস এস' আর 'বি জে পি' পন্থীদের তোলা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের অভিযোগ যে এইভাবে সংস্কৃতি আর দু'বাংলার মিলনের হুজুগে দিনে দুপুরে সত্যি প্রমাণিত হবে, এটা বাজারী সাংবাদিকদের কল্পনাতীত। যতটা মোলায়েম উপস্থাপনা হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে, এই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কতো, আনন্দবাজার সে বিষয়ে নিশ্চুপ।

৮ অক্টোবরের 'বর্তমান' সে বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সচেষ্ট হয়েছে এইভাবে। তাদের সংবাদ শিরোনাম হলো : দুই বাংলার মিলন উৎসবের সুযোগে বড় সংখ্যক বাংলাদেশী ঢুকে পড়ল পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু তার সংখ্যা কতো সেটা বোঝাতে গিয়ে সাংবাদিক মহাশয় যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তাহলো 'বড় সংখ্যক', 'প্রচুর', 'বিপুল' বা ''ওপার থেকে আসা জলযান থেকে লোক নেমে 'পিলপিল' করে পাড়ে উঠে যায়"।

এই অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা ছাপার অক্ষরে পাওয়ার জন্য আমাদের আরও দুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১০ অক্টোবরের বর্তমান লিখেছে : ''অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজে অভিযানে পুলিশ, ধৃত মাত্র ১ : ...কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠিয়ে জানিয়েছে যে, দশমীর দিন দুই বাংলার যৌথ মিলনের উৎসবকে ঢাল করে ৫০ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী এপারে এসে আর ফিরে যায়নি।" ...''দশমীর আগে কয়েকদিন আগে সীমান্তের গ্রামগুলিতে রীতিমত মাইক নিয়ে মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে ভারতে আসার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হয়।"...''স্থানীয় সূত্রে খবর, সেদিন যারা অবৈধ ভাবে এদেশে ঢুকেছিল, তারা বসিরহাটে নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ছড়িয়ে পড়েছে।"

এর আগেই বর্তমান লিখেছিল, (দশমীর দিন) ''রাস্তার উপর যেভাবে শ'য়ে শ'য়ে বেআইনি বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের টেবিল দেখা গেল, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই বিপুল অনুপ্রবেশ পূর্বপরিকল্পিত।"

বলা বাহুল্য, এই অনুপ্রবেশকারীদের ৯০ শতাংশ হলো বাংলাদেশী মুসলমান এবং তাদের মধ্যে নাশকতাবাদী মুসলিম জঙ্গি থাকার সম্ভাবনাকে আদৌ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বাঙালি মুসলমানদের ভয়ংকর বিষয়টিকে আমরা কখনও গুরুত্ব দিতে চাই না। আজকের বাংলাদেশী মুসলমানরা আমাদের কত ভালো প্রতিবেশী সে বিষয়ে আরও অনেকে গবেষণা চালাবেন। চালান, তাতে প্রশাসন, পুলিশ আর রাজনৈতিক নেতাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অনুপ্রবেশের বিষয়ে কড়া মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরামের সম্পাদক, সমাজমনস্ক ও জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জীর দায়ের করা একটি আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি জ্ঞানসুধা মিত্র আদেশ দিয়েছেন, ''যাতে প্রশাসন টাকিতে বিসর্জনের সময় ঢুকে পড়া অনুমিত ৫০ হাজারের বেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সকলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে"। সংবাদে প্রকাশ, বিজয়া দশমীর দিনে উত্তর ২৪ পরগণার টাকিতে দুই বাংলার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের সময় সুযোগ পেয়ে ৫০ হাজার বাংলাদেশী ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে এবং এতে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট উদ্বিগ্ন।

জয়দীপবাবু তার আবেদনে বলেছিলেন, ''অনুপ্রবেশকারীদের বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া অপরাধ। অবৈধ বাংলাদেশীরা ঢুকছে আর পুলিশ প্রশাসন তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, তা বরদাস্ত করা যায় না। এতে দেশের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হচ্ছে। শুধু সন্ত্রাসবাদীর ভয় নয়, এই অনুপ্রবেশের ফলে দেশের জনসংখ্যার ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে।" (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৪/১০/২০১১)।

এতদিন এই কথাগুলো যারা বলতো, তারা অসাম্প্রদায়িক উদার সাংবাদিককুলের বিচারে ভয়ংকর সাম্প্রদয়িক প্রাণী। এখন জয়দীপবাবুকে কি বলা হবে? আর এস এস/বি জে পি-র এজেন্ট! সে যাই হোক, এখনো ৫০ হাজার অনুপ্রবেশকারীর ৫ জনও গ্রেপ্তার হয়নি। তাহলে কি কেন্দ্রীয় সরকারের (মনমোহন-সোনিয়া সরকার) অধীন বর্ডার সিক্যুরিটি ফোর্স (বি এস এফ) আর রাজ্য সরকারের (মমতা ব্যানার্জী) পুলিশ প্রশাসন আদালত অবমাননার দায়ে পড়তে চলেছেন?

অনুপ্রবেশ আর অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার হাতিয়ার করে বাঙালি মুসলমানরা বাঙালি হিন্দুদের দ্রুত সংখ্যালঘু করে দিতে চলেছে।

আর আশ্চর্যের বিষয় হলো তবুও বাঙালি হিন্দু একই বৃন্তে দুটি কুসুম হওয়ার অলীক সাধনায় মত্ত থেকে সামনের বছর বিজয়া দশমীর দিন আরও পঞ্চাশ হাজার অনুপ্রবেশকারীর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, তবু পাঁচশ সংখ্যায় জড়ো হয়ে লাঠি হাতে বিদেশী শত্রুর মোকাবিলা করবে না, দেশের মাটি আর সম্মান বাঁচানোর চেষ্টা চালাবে না।

জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা নীতি চাই : আর এস এস

উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে গত ১৪-১৬ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবটি এখানে প্রকাশ করা হলো। — সঃ স্বঃ

ভারতের সীমান্তে দেশের শত্রুদের ক্রমাগত প্ররোচনামূলক উস্কানি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মদত দেওয়া, ভারতের আকাশ ও সমুদ্রপথে আক্রমণাত্মক গতিবিধি এবং মহাকাশে দেশের স্বার্থবিরোধী নজরদারির প্রতি ভারত সরকারের উপেক্ষার মনোভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে কার্যকারী মণ্ডল দেশের জাতীয় নিরাপত্তার বিপদ সম্পর্কে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

লালচীনের আগ্রাসী চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিককালে চীন-ভারত সীমান্ত-এলাকায় লালচীন তার সামরিক শক্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করেছে। চীনা সেনা সীমান্ত পেরিয়ে যথেচ্ছভাবে ভারতীয় নাগরিকদের সম্পত্তি নষ্ট করছে এবং সীমান্তে সন্ত্রাস ছড়ানোর কাজ অনবরত করে চলেছে। তাছাড়া আমাদের প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রেও চীন তার সেনা-ঘাঁটি স্থাপন করেছে। উদ্দেশ্য, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা। ভারত সরকারের এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সশস্ত্র সামরিক প্রস্তুতি ও সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া, পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে চীনা সেনার উপস্থিতি, নেপালে মাওবাদীদের মাধ্যমে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ এবং বাংলাদেশ, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি থেকে স্পষ্ট যে, ভারতকে ধ্বংস করতে চতুর্মুখী আক্রমণের সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেছে।

কার্যকারী মণ্ডলের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া ছাড়াও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে চীন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে। ভারতের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রতি এটি চীনের একটি চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি চীনের 'সাইবার' সেনারা ভারতের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, চীনা সামরিক গোয়েন্দারা আকাশপথে ভারতের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। চীনের এই অঘোষিত সাইবার যুদ্ধ ভারতের নিরাপত্তাকে গভীর সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে।

১৯৬২ সালে চীন সামরিক তৎপরতা চালিয়ে ভারতের ৩৮,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জবরদখল করেছিল। ওই বছরের নভেম্বরে সংসদে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তা বর্তমান ভারত সরকার বিস্মৃত হয়েছে। অন্যদিকে চীন আমাদের দেশের আরও ৯০,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীনের অংশ বলে দাবি জানিয়েছে। অথচ এই অন্যায় অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে ভারত সরকার নরম মনোভাব দেখাচ্ছে। দেশের স্বার্থের পক্ষে এমন নরম মনোভাব বিপজ্জনক। ভারত সীমান্তে চীনা সামরিক শক্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল সীমান্ত এলাকায় রেল, সড়ক, বিমান ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার কিছুই করা হচ্ছে না। এটি অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

সম্প্রতি চীন ভারতের সীমান্ত এলাকায় দূরপাল্লার পরমাণু বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তিশালী ঘাঁটি গড়েছে। পরমাণুশক্তিচালিত চীনা ডুবোজাহাজের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র ৮,৫০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। অথচ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়ে ভারত সরকার ক্রমাগত উপেক্ষা করে চলেছে।

ভারতীয় বাজারে চীনা পণ্যের বিপুল অনুপ্রবেশ দেশজ শিল্প সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে দিচ্ছে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেরও ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। ভারত সরকার টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে প্রথম পর্যায়ে গুরুত্ব দেয়নি। ফলে এখন ৩-জি এবং ৪-জি টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায় চীন ভারতকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের এখন বাধ্য হয়েই চীনা প্রযুক্তি আমদানি করতে হচ্ছে। এটি একটি লজ্জাজনক ঘটনা। চীনা প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্যই চীনের সাইবার গোয়েন্দারা অতি সহজেই ভারতের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নষ্ট করতে পারছে। ভারতের তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রেও চীনা প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম অবাধে ব্যবহার করা চলেছে। পরিণামে আমরা ধীরে ধীরে চীনের আশ্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছি। চীন তার অধিকৃত এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদে বাঁধ নির্মাণ করে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এর ফলে ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তরে চীনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে ভারত সরকারের অবিলম্বে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

পাক চক্রান্ত

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দেশের নিরাপত্তার পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই বিপদের কথা স্বীকার করেছেন। সম্প্রতি সেনা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিগত কয়েকমাসে ভারত—পাক সীমান্তে অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানা গেছে, একমাত্র কাশ্মীর সীমান্তে গত সাড়ে চার মাসে অনুপ্রবেশ এবং গুলি চালনার কমপক্ষে ৭০টি ঘটনা

ঘটেছে। তাছাড়া পাক সেনাবাহিনীতে ইসলামি কট্টরপন্থীদের প্রভাব যেভাবে বাড়ছে তা ভারতের পক্ষে চিন্তার বিষয়। বিশেষভাবে পাকিস্তানের সেনা ঘাঁটিতে রাখা পরমাণু বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রগুলি কট্টরপন্থীদের হাতে পড়লে তা ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে। এর প্রতিরোধে রক্ষাকবচ প্রস্তুত করাই ভারতের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ। সম্প্রতি সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের এক নম্বর খলনায়ক ওসামা বিন লাদেনকে মার্কিন কম্যান্ডোরা পাকিস্তানের মাটিতে হত্যা করেছে। ওসামা বিগত কয়েক বছর ধরে সপরিবারে পাকিস্তানেই আত্মগোপন করে বসবাস করছিল। পাক সামরিক বাহিনী এবং পাক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আইয়ের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া দীর্ঘকাল এইভাবে বাস করা সম্ভব ছিল না। ওসামা-আই এস আই যোগসাজস থেকে স্পষ্ট যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর। পাকিস্তান থেকেই ভারতসহ সারা বিশ্বে ইসলামি জেহাদি সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে রাখতে হবে পাকিস্তানে যে চিকিৎসক আত্মগোপনকারী ওসামাকে চিহ্নিত করেছিলেন তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে পাক সরকার গ্রেফতার করেছে। সেই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পাক-স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামিদ কারজাই সরকারের পতনের জন্য সেখানে পাকিস্তানের মদতে লাগাতার নাশকতা চলছে। আগামী বছরে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা ঘাঁটি প্রত্যাহার করা হবে। পাকিস্তান চাইছে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আফগানিস্তানে ফের তালিবান শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। আফগানিস্তানের যে কোনও পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল পাক-আফগান ক্ষেত্রের এই ঘটনাগুলির দিকে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চায়।

কিছুদিন পূর্বে দিল্লী হাইকোর্টের বাইরে বোমা বিস্ফোরণে আরও একবার আই এস আইয়ের যোগসাজসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অন্যদিকে মাওবাদীদের সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আই এস আই নেটওয়ার্ক চীনকে সাহায্য করছে, এরও বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পাক-আফগানে সক্রিয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হক্কানি জোটের সঙ্গে আই এস আইয়ের সম্পর্ক এখন বিশ্বপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এসবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের মনোভাব এখনও উদাসীন।

বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পর্কিত

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে বার্তালাপে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দিকে পুরো নজর দেওয়া হয়নি। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার একর ভারতীয় ভূমি 'ওদের অবৈধ অধিকারে তো আগে থেকেই আছে'— এই বলে বাংলাদেশকে দেশের জমি দান করা কোনওভাবেই উচিত বলে মানা যেতে পারে না। জমি বিনিময়ের সময় কম জমি নিয়ে বেশি জমি দেওয়ার চিন্তাভাবনা বিবেকহীন এবং অস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এমন করলে কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ির মতো জেলাগুলিতে বিশাল সংখ্যক বাংলাদেশী মুসলমান ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে যাবে। যার পরিণাম স্বরূপ ওই সমস্ত এলাকাগুলিতে জনসংখ্যার চরিত্র বদলের ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দেবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সমস্ত বার্তালাপে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর বিষয়ে কোনও চর্চাই হয় না। কার্যকারী মণ্ডলের দাবি, বাংলাদেশের সঙ্গে বার্তালাপে রাষ্ট্রহিত, একতা এবং ক্ষেত্রীয় অখণ্ডতার মতো বিষয়গুলিকে সর্বোপরি রাখতে হবে।

হিন্দু মহাসাগর ক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ

অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল এই ব্যাপারেও চিন্তিত যে, হিন্দু মহাসাগর এলাকাতে নতুন শক্তিগুলির মধ্যে তীব্রতর লড়াইয়ে এই ক্ষেত্র ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়ের ইউরোপের মতো আখড়া তৈরি হচ্ছে। হিন্দু মহাসাগর উপকূলের দেশ সম্পদযুক্ত এবং নতুন শক্তি সমীকরণে রাজনীতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলে ভারত প্রমুখ স্থানে আছে। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের অভিমত হলো, এই সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে দু-হাজার বছর ধরে চলে আসা সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আরও সুদৃঢ় করা উচিত।

চীন নিজের সামুদ্রিক শক্তি তথা নৌসেনার গতিবিধি অত্যধিক বৃদ্ধি করছে। এই অঞ্চলগুলিতে চীনের আক্রমণাত্মক উপস্থিতি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকা দিয়াগো-গার্সিয়ার সুদূর অঞ্চলে নিজেকে প্রতিকূলতার মধ্যে দেখে এই সমস্ত অঞ্চলকে সামনে পেয়ে নিজেদের দখলকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় রয়েছে।

২০০৬ সালে ইন্দোনেশিয়া থেকে ইস্ট টিমোর আলাদা হওয়া, প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এবং এল টি টি ই-র সংঘর্ষ, তাইওয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ শক্তি সংঘর্ষের দ্যোতক। এই দুই শক্তি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ফলে সমতা নষ্ট করে উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। আমাদের সরকারের পূর্বমুখী ('লুক ইস্ট') নীতির ২০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কার্যকারী মণ্ডল আগ্রহ প্রকাশ করছে যে, এই নীতি যথাযথ রদবদল করে পূর্ব ক্ষেত্রের প্রত্যেকটি দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হোক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের বিদেশ নীতি গৃহীত হওয়া উচিত। এব্যাপারে মায়ানমার, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সঙ্গে গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে প্রতিনিধিসভা স্বাগত জানাচ্ছে।

হিন্দু মহাসাগরে চীন ও তার সহযোগী দেশগুলির যুদ্ধোন্মুখ কার্যকলাপ ভারত সম্প্রতি অনুভব করেছে। বিগত দিনের দুটি ঘটনা এইরকম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। প্রথমটি হলো, ভিয়েতনামের কাছে দক্ষিণ চীন সাগরে ভারত ও চীনা নৌসেনার মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয়টি হলো সিন্ধু সাগরে (আরব সাগর) ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দরের ঘটনা। গ্বাডর থেকে হাম্বনতোটা এবং চট্টগ্রাম থেকে কোকো দ্বীপ পর্যন্ত হিন্দু সাগরে ক্রমাগত বাড়তে থাকা চীনা প্রভাব আমাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপদঘণ্টা। হিন্দু মহাসাগরে নিজেদের সেনার উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য চীন ১০০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে পলি মেটেলিক সালফাইডস্ খননের অনুমতি নিয়েছে।

আমাদের সশস্ত্র সৈন্যশক্তি এরকম বিপদ প্রতিহত করার জন্য সর্বদা তৈরি। আমাদের নৌবাহিনী অনেকবার তাদের ক্ষমতা প্রকাশও করেছে। কিন্তু বর্তমান সরকার তাদের আধুনিক পরিকাঠামো তথা অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি নজর দিচ্ছে না। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে বিদ্যমান জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা এবং আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিগত দৃষ্টিকোণের মধ্যে বিস্তর ফারাক আছে। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা, সৈন্যক্ষমতা এবং দেশভক্তির বীজ বর্তমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সমস্ত অভিব্যক্তি সরকারের নীতিগত পদক্ষেপে দেখা যায় না।

সুরক্ষা সম্পর্কিত এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের জন্য অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল সরকারের কাছে নিবেদন করছে যে, ভারত-তিব্বত সীমান্তসহ দেশের সম্পূর্ণ সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দেশের সুরক্ষার জন্য ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। সেইসঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের মতো সুরক্ষা সম্পর্কিত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। কার্যকারী মণ্ডলের আবেদন, সরকার সমস্ত দেশের সামনে আগত চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিকারের জন্য কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক এবং বৃহৎ উদ্যোগের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের জন্য মহৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ করুক। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়গুলির ওপর সর্বদা সজাগ থেকে সরকারকে এবিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য করুন।

পরিত্যক্ত শিশু অথবা টাকার থলি

অনিন্দ্যকান্তি সিংহ

সর্বব্যাপী সংবাদমাধ্যমের দৌলতে আজকাল আমরা শুনতে বা দেখতে পাই বিশাল অঙ্কের ভর্তি টাকার ব্যাগ একজন হতদরিদ্র মানুষ থানায় জমা দিচ্ছেন, আর সেই কারণে নানা স্তরের মানুষের প্রশংসার পাত্র/পাত্রী হয়ে উঠছেন। কিন্তু একটু ভিন্ন দিকে সেই একই ধারার মানুষ ফেলে যাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রেই প্রায়ই অন্যরকম আচরণ করে চলেছেন। তাঁরা শিশুটিকে ভগবৎ-প্রদত্ত বা ঈশ্বর প্রেরিত বলে মনে করতে থাকেন অথবা সন্তানহীন দম্পতি সেই শিশুটিকে পুত্র-পুত্রী স্নেহে লালন-পালন করতে থাকেন। এমনকী অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পড়ে থাকা বাচ্চাকে তাঁরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতেও দ্বিধা করেন না। এ পর্যন্ত প্রত্যেকটিই মানবিক এবং কাম্য পদক্ষেপ। কিন্তু মুশকিল ঘনিয়ে ওঠে তার পর থেকেই। অবধারিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে মানবিক পরাকাষ্ঠার স্বাক্ষর তাঁরা রাখলেন বটে, কিন্তু যে বা যারা শিশুটিকে ফেলে গেছে তাদের সমপর্যায়ের অন্যায় তাঁরাও করতে থাকলেন। বস্তুত এই ধরনের শিশুদের যত্ন, সমস্তরকম সুরক্ষা ইত্যাদি পাবার অধিকার সুরক্ষিত রাখার বিশেষ আইন আমাদের দেশে কার্যকরভাবে উপস্থিত। সেই দেশীয় প্রচলিত শিশু-সুরক্ষা আইনের তোয়াক্কা না করার ফলে সেই শিশুটি নানাভাবে তার অধিকার ভঙ্গের শিকার হতে থাকে বাকি সারাটা জীবন ধরে। যার সারা জীবনের যোগফলকে শুধুই বেঁচে থাকার মূল্যে শোধ করা যায় না।

এ গেল বিভিন্নভাবে বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে একটি ধরনের পরিত্যক্ত শিশু। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাবা বা মা সচেতনভাবে নানা সামাজিক, আর্থিক কারণে হয়তবা তাঁদের সদ্যোজাত বাচ্চাকে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ফেলে রেখে চম্পট দেন। বাচ্চাটি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে সকলের মনোরঞ্জনের পাত্র হয়ে ওঠে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি হৃদয় বিগলিত করবার মতো মানবিক মনে হলেও শিশুটি নানাভাবে তার স্বাভাবিকতা হারাতে থাকে। শিশুদের জন্মগত নিরাপত্তার বোধ সবচেয়ে প্রবল থাকে। এক এবং অদ্বিতীয় মায়ের কাছেই সেই নিরাপত্তা বোধ সর্বোচ্চ মাত্রা পায়। কিন্তু নানাজনের সাময়িক অকুণ্ঠ নিরাপত্তা প্রদানে তার নিরাপত্তা বোধটিই ধাক্কা খায় যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব-অনুযায়ী বয়স্ক নাগরিকদের জীবনে যে সমস্ত মানসিক বা আচরণগত সমস্যা দেখা যায় তাদের অনেকগুলির উৎস নিহিত অপরিণত শৈশবকালীন মনে কোনও বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্যে। এইরকম মা-বাবার কারণেই অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুদের ক্ষেত্রে কোনও সহৃদয় আয়া, নার্স, ডাক্তারবাবু, হাসপাতাল সুপার, নার্সিংহোমের কেষ্টবিষ্টু, সর্বোপরি পুলিশ তাদের পরিচিত নিঃসন্তান দম্পতির হাতে বাচ্চাটিকে যদি তুলে দিতে পারেন তবে সকলেই বিশাল মাপের একটি মানবিক কাজ খুব সস্তায় নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে গেল বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু সেই শিশুটিকে তাদের অজ্ঞতার কারণে যে প্রায় জলাঞ্জলি দিলেন সেই বোধটা এখনও জাগানো যায়নি নানা কারণে। এই বাপারে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই এখনও মহাভারতীয় কর্ণ-অধিরথ আবেগ জাজ্বল্যমান। আর এতসব ব্যাপারের মধ্যে সাধারণ মানুষ আইনি ব্যাপারটি তলিয়ে দেখতেও অভ্যস্ত নয়। বরং শিশুদের নিয়ে একটা পুতুল পুতুল আদিখ্যেতা আমাদের বেশীরভাগ 'বড়'-দের মধ্যেই আছে।

এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বিশেষ ধরনের 'শিশুদের অধিকার' ব্যাপারটি নিয়ে ছেলেখেলা করার একটি স্বাভাবিক প্রয়াস বিভিন্নভাবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। অনেকসময় যার মধ্যে আর্থিক লেনদেনেরও ব্যাপার থেকে যায়। এদের জানা নেই বা জানার আগ্রহ নেই যে জন্মগত কিছু অধিকার একটি শিশু পূর্ণবয়স্ক নাগরিক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলে। আমাদের আলোচনার শিশুরা জন্মেই যে অধিকারটি হারায় তা হল পিতৃমাতৃ পরিচয়। 'অনাথ' হয়ে যাওয়ার এই অর্জিত আখ্যা তার পরবর্তী সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমাদের শিশু বিষয়ক আইনী অজ্ঞতার কারণে অথবা 'শিশুদের অধিকার' বিষয়টিকে অত্যন্ত অবহেলা করার প্রবণতা থেকে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই শিশুদের বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে ব্যাপারটি স্বীকৃত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মা ও শিশু যেহেতু অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ তাই দেশীয় আইনে নারী ও শিশুকল্যাণ বিষয়দুটি একই

বিভাগের অন্তর্গত। পরবর্তীকালে, রাষ্ট্রপুঞ্জের (United Nations) নেতৃত্বে একটি প্রস্তাবনার সনদে স্বাক্ষরকারী সমস্ত দেশ মেনে নিতে বাধ্য হলো শুধুমাত্র শিশুদের বিভাগটি। সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার— ব্যাপারটি যেমন প্রতিষ্ঠা পেল, সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে 'শিশুদের অধিকার' সুরক্ষিত রাখার বা করার একটি নতুন হাতিয়ারের জন্ম হলো বলা চলে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় (General Assembly) শিশুদের অধিকার বিষয়ক একটি বিস্মৃত দাবী সনদ ১৯৮৯ সালে গৃহীত হলো ৩০ নভেম্বর তারিখে [Convention on the Rights of the Child (CRC)]। ইতিমধ্যে সারা ভারতে কার্যকরী শুধুমাত্র শিশু সংক্রান্ত একটি আইন জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট, ১৯৮৬ নামে চালু ছিল। ১৯৯২ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে CRC-তে স্বাক্ষর করার পর ২০০০ সালে নুতন আঙ্গিকে জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার এ্যান্ড প্রোটেকশন অব চিলড্রেন) অ্যাক্ট, ২০০০ চালু হয়। বর্তমানে ২০০৬ সালে সংশোধিত রূপে এই আইনটি শিশুদের সার্বিক অধিকার রক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে চালু রয়েছে। দেশে প্রায় দেড় ডজন খানেক যেসব শিশু সংক্রান্ত আইন আছে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংরক্ষিত করার প্রশ্নে, তার মধ্যে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট ২০০০-টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেখানে শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আগে যেখানে শিশুদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে তাদের কল্যাণের কথা ভাবা হোত (Need-based Approach), এখন সেখানে বলা হলো তাদের অধিকারের কথা মাথায় রেখে কল্যাণের ব্যবস্থা করতে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে (Right-based Approach)। আবার রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বে যে CRC-র সংযোজন, তার দ্বারা প্রভাবিত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে শিশুটির বা শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ (the best interest principle)-কে এবং পরিণতমনস্ক শিশুদের তাদের প্রতি বিচার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার অধিকার (Right to Participation)- কে সুনিশ্চিত করে। যদিও সমালোচকেরা বলে থাকেন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই ঠিকঠিকভাবে জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট, ২০০০-এ প্রতিফলিত হয়নি। তবু প্রাথমিকভাবে বলা যায়, এই দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও তথাকথিত 'বড়'-দের একটা ভূমিকা থেকেই গেল।

জন্মগত কিছু অধিকার একটি শিশু পূর্ণবয়স্ক নাগরিক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলে। আমাদের আলোচনার শিশুরা জন্মেই যে অধিকারটি হারায় তা হল পিতৃমাতৃ পরিচয়। 'অনাথ' হয়ে যাওয়ার এই অর্জিত আখ্যা তার পরবর্তী সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমাদের শিশু বিষয়ক আইনী অজ্ঞতার কারণে অথবা 'শিশুদের অধিকার' বিষয়টিকে অত্যন্ত অবহেলা করার প্রবণতা থেকে।

এতক্ষণ যে শিশুদের কথা আমরা বলছিলাম, তাদের 'সর্বোত্তম স্বার্থ' সুরক্ষিত হতে পারে যদি তাদের আইনের নির্দেশ মেনে অর্থাৎ আইনসঙ্গত উপায়ে কোনও ইচ্ছুক ব্যক্তি বা দম্পতিকে দত্তক দেওয়া যায়। কেননা পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ মায়া মমতার ঘেরাটোপে বড় হয়ে এইটাই একটি বাচ্চার সর্বোত্তম স্বার্থ (the best interest)-কে মর্যাদা দেয়। সারা বিশ্ব জুড়ে এই মতটিই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, সেই পরিত্যক্ত বাচ্চাটি আইন নির্দিষ্ট পথে 'দত্তক-এ দেবার ক্ষেত্রে কোনও আইনগত বাধা নেই' (Legally free for adoption)-এইরকম ঘোষিত হতে হবে। পরবর্তীকালে উপযুক্ত দম্পত্তি বা কোনও একক সক্ষম ব্যক্তি সেই শিশুটিকে দত্তক নিতে পারেন। এ ব্যাপারে সরকারী সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুমতি প্রাপ্ত বিভিন্ন Adoption Placement Agency-র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে যারা আবার কেন্দ্রীয় দত্তক প্রদান অথরিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরিণত মনের শিশুকে দত্তক নেবার ব্যাপারটি সেই শিশুটির অনুমতি সাপেক্ষ।

এই দত্তক প্রক্রিয়াটি একমুখীন, অর্থাৎ একবার আইনত দত্তক নেওয়া হয়ে গেলে বাচ্চাটির সমস্ত দায়িত্ব দত্তকে আগ্রহী ব্যক্তি বা দম্পতির কাঁধে এসে পড়ে। তাদের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী যেমন সে হবে, নূতন মা-বাবার প্রতি সামাজিক এবং আইন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনেও সেই সন্তান বাধ্য থাকবে। সুতরাং, আইন নির্দিষ্ট এই যে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া তা অবহেলিত বা উপেক্ষিত থাকলে উভয় পক্ষেরই সামূহিক বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বাস্তবে এমন বিপদে পড়েছেন এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আমাদের সামনে আসছে।

ধরা যাক, কোনও আয়া, নার্স, হাসপাতাল সুপার বা নার্সিং হোম কর্তৃপক্ষের 'বদান্যতায়' কোনও দম্পতি আইনের তোয়াক্কা না করে একটি সন্তান লালন- পালন করে 'মানুষ' করে 'বাবা-মা' হলেন। সম্পত্তিলোভী ঈর্ষাকাতর কোনও নিকট আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি যদি তথাকথিত মা-বাবার সঙ্গে বাচ্চাটির কোনও আইন অনুমোদিত সম্পর্ক নেই বলে প্রমাণ দাখিল করেন তবে সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সেই বাচ্চাটিরই বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা প্রবল থেকে যায়— অন্যান্য সম্পর্কের কথা না হয় বাদই দিলাম। আর ইতিমধ্যেই সেই ''বাবা-মা'' অথবা তাদের যেকোনও একজন মারা গেলে তাদের 'সন্তান' অগাধ জলে পড়ে গেছে এমন উদাহরণও বড় কম নয়।

এ পর্যন্ত আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি তাতে শুধুমাত্র সদ্যোজাত পরিত্যক্ত শিশুদের অধিকারের প্রশ্নেই আমাদের আলোচনা সীমায়িত ছিল। কিন্তু যে আইনী গণ্ডীর মধ্যে এই শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার সংস্থান আছে সেই আইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হয়নি এমন সকল ছেলেমেয়ে 'শিশু'। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বেশী সেই হিসাবে 'শিশু' জনসংখ্যা। সুতরাং, সমস্তরকম শিশু-র ১৮ বছর ব্যাপী শৈশবকালীন অধিকার আমরা যদি আরও বেশী সচেতনতার সঙ্গে, গুরুত্বের সঙ্গে প্রয়োগ করতে শিখি তবে সামগ্রিকভাবে তা শুভ ফলপ্রসূ হবে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ— একটি আপ্তবাক্য হয়ে নয়, তা সম্ভাবনাময় বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।

ভারতে শিশুকন্যা দত্তক নেওয়া বেড়েছে

দত্তক শিশুকন্যার সঙ্গে অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন।

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ একদিকে কন্যাভ্রূণ হত্যার কুসংস্কারগ্রস্ত হিংস্র অন্ধকার দিকের ছবি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অন্যদিকে শিশুকন্যা দত্তক নেওয়ার রেওয়াজ বাড়ছে এদেশেই— এ খবর পাওয়া যাচ্ছে। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চিত্র আমাদের সামনে হাজির হওয়ার পর মনে হয় অন্ধকারের বুক চিরে শুভ চেতনার উজ্জ্বল আলো কিছুটা হলেও ছড়িয়ে পড়ছে। সেন্ট্রাল অ্যাডাপটেশন রিসোর্স এজেন্সি জানাচ্ছে অত্যন্ত সুখের ও আনন্দের বার্তা, শিশুকন্যা দত্তক নেওয়ার আগ্রহ ভারতে দ্রুত বাড়ছে। জন-মানসিকতায় অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। সংস্থার সদস্য সচিব অনু জে সিং বলেছেন সামাজিক বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র কিংবা বাস্তবজীবনের ঘটনা যাই-ই এই মানসিকতা বদলে প্রভাব ফেলুক না কেন, স্বীকার করতে হবে পুরনো দিনের ধ্যানধারণা পাল্টাচ্ছে। লোকে শিশুকন্যা দত্তক নিয়ে আদর ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চাইছে।

একনজরে ছবিটা দেখা যাক। ২০০৮ সালে ২,৯৯০টি শিশুর মধ্যে ১,৮১৯টি শিশুকন্যাকে দত্তক নিয়েছে বিভিন্ন পরিবার। এরা দেশের মধ্যে রয়েছেন, কেউ কেউ বাইরে। ২০০৯ সালে দত্তক নেওয়া ২,৫১৮টি শিশুর মধ্যে ১,৪৩৬টি কন্যা। গত বছর সংখ্যাটা একটু কমেছিল। ৬,২৮৬ জন দত্তক নেওয়া শিশুর মধ্যে ২,৬৩৮ জন ছিল কন্যা। এর পিছনে কিছু সঙ্গত কারণ আছে— কেন্দ্রীয় সংস্থা বলেছে।

শিশুকন্যা দত্তক নেওয়ার ক্ষেত্রে সবটাই নির্ভর করে পাওয়ার উপর। এক দম্পতি শিশু-কন্যা চাইলেন আমাদের কাছে। কিন্তু নেই। তাঁরা চলে গেলেন একটা শিশুপুত্র নিয়ে। গত কয়েক বছরে দত্তক গ্রহণের আগ্রহ খুব বেড়েছে। সব দেখেশুনে বলা যায় জনমানস অনেকটা বদলেছে। লোকে এখন শিশুকন্যা চাইছে। একথা জানালেন অনু জে সিং।

শিশুকন্যার চাহিদা বাড়ছে—এটা স্বীকার করেছেন আমোদ কান্থ। তিনি দিল্লি কমিশন ফর প্রোটেকসন অফ চাইল্ড রাইটস সংস্থার প্রধান। জানিয়েছেন, আমাদের কাছে দত্তক গ্রহণে আগ্রহীরা আসছেন, তাঁদের সংখ্যা বেড়েছে। বেশিরভাগই শিশুকন্যা চাইছেন। এইরকম আগ্রহ দেখে ভালো লাগছে আমাদেরও।

ঋষি ওয়াধা আর তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী বিয়ের আট বছর পরেও সন্তানহীন থাকায় একটি শিশুকন্যাকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুদিন অপেক্ষার পর তাঁরা একটি শিশুকন্যাকে পান। মায়েশা তার নাম। এখন চার বছরের ফুটফুটে শিশু ওয়াধা দম্পতির কাছে যেন দেবদূতী। বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন একটি শিশুকন্যাকে দত্তক নিয়েছেন। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু আইনে তাতে কোনও বাধা নেই। তিনি কিছুদিন আগে আর একটি শিশুকন্যাকে দত্তক নিয়েছেন। তার নাম আলিশা।

জানা যাচ্ছে একবছরে ৬০০ শিশু দত্তক নিয়েছেন বিভিন্নজন। পরিত্যক্ত গরীব, অনাথ শিশুদের পালন করার দায়িত্ব নেয় দিল্লির 'পালন' নামে সংস্থা। যাদের দত্তক নেওয়া হয়েছে তাদের ৬৫ শতাংশ শিশুকন্যা। দত্তক নেওয়ারও আইন চালু ১৯৫৬ সাল থেকে, তাতে বেশ কড়াকড়ি আছে। অনু জে সিং বলেছেন, আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখি শিশু যে পরিবারে যাচ্ছে সেখানে নিরাপত্তা স্নেহ ভালোবাসা ঠিকমতো পাবে কিনা।

একা পুরুষকে কোনও কন্যাসন্তান দেওয়ার রীতি নেই। এই রীতির বিরুদ্ধে লোকজনের অনেক অভিযোগ আছে। অনু জে সিং বলেছেন, 'আমরা দেখেছি যখন শিশুকন্যা বড় হবে সে অনেক ব্যাপারে প্রশ্ন করবে এবং অস্বস্তি বোধ করবে বাবার সঙ্গে আলোচনায়। এই জন্যেই এই নিয়ম আমরা মানছি।'

দিদি-ভাই ফোঁটা

ইন্দিরা রায়

ভাইফোঁটার সকাল। ছোট্ট নিকানো বাড়ির দাওয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে লেগে পড়েছে মেয়েরা। সকাল থেকেই ব্যস্ততা। কেউ বা ঘর গোছাতে ব্যস্ত; কেউবা ঘরের মেঝেতে আলপনা

এঁকে ধানদূর্বা থালায় সাজাচ্ছে। মাঝে একটা আসন পাতা। কিন্তু সেই আসনে বসবে কে! এ বাড়িতে তো মেয়েরাই সব। কোনও ভাই বা ছেলে তো নেই! কেন এই আয়োজন!

এই ছবিটা বৈদ্যবাটির মাটিপাড়ার এক অতি সাধারণ ঘরের। এ বাড়িতে সাত বোন আর মা নিয়েই সংসার। কোনও পুরুষ নেই। বাবা যখন গত হন; তখন ছোট বোন ছিল ন' মাসের। দিদি সংসারের দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেন। ছোট ছোট বোনেদের পেটের খিদে মেটানো, ছোট বোনের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া, বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রস্থ করা— সবই দিদির দায়িত্বে।

অন্য রকম

মামার বাড়ির দিদার দেওয়া সামান্য জমিতে ঘর তৈরি করে দিন কাটানো। পুরুষ-নারীর একত্র মিলন দেখা গেল দিদির মধ্যে। একদিন হঠাৎই প্রবীণা দিদা তাঁর নাতনিদের জানান— ভাইফোঁটার দিন তোরা ভাই-এর মতো দিদিকে ফোঁটা দিবি। দিদিরও মনটা এই বিশেষদিনে বিষণ্ণ থাকত ঘরে একটাও ভাই না থাকাতে। সব বাড়িতে এই দিনে কেমন শাঁখ-উলু, হইহই শোনা যায়, নিজেদের বাড়ি শুনশান। সেই শুরু। মামাতো বোন ও নিজের সেজ বোন প্রথম দিদিকে আসনে বসিয়ে নতুন জামাকাপড় দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে খাবারের থালা সাজিয়ে দিদির কপালে ফোঁটা দেওয়া শুরু করল।

'আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে এই 'দিদি ফোঁটা'র আয়োজন শুরু।' বলে চললেন বাড়ির অন্যতমা বোন। 'সেই প্রথম শুরু হবার পর প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম হয়নি। দিদিকে নতুন কাপড়, জামা ইত্যাদি কিনে দেয় বোনেরা। সকাল থেকে উপোস করে বোনেরা দিদি ফোঁটার আয়োজনে মেতে ওঠে। দিদির আসনের সামনে প্রদীপ, ধান-দুব্বো ও মিষ্টির থালা সাজিয়ে ফোঁটা দেওয়া হয় শাঁখ-উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে। দুপুরে থাকে ভুরিভোজের আয়োজন। কবজি ডুবিয়ে না হোক, পেট পুরে জিভের স্বাদে তৃপ্তি পান সকলে। এই ভোজের খরচ কিন্তু স্বয়ং দিদি-ভাই এর। এদিন দিদিকে সহোদরাদের ও তুতো বোনেদের প্রণাম জানানোর পর দিদি সবাইকে আশীর্বাদ করেন। সত্যিই প্রবীণা দূরদর্শী দিদার এই রীতিকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারে না এই বাড়ির বোনেরা। যদি এমনটি না হোত; আনন্দে ভরে উঠত না এ বাড়ির ছোট্ট পরিমণ্ডল। যুগ যুগ জিও এই 'দিদি-ভাই-ফোঁটা'!

দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলের বিরুদ্ধে জনগণের অনাস্থা

চার রাজ্যে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি চারটে রাজ্যে যে উপ-নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে— সাফল্য লাভ করেছে বিজেপি বা বিজেপি জোট। হরিয়ানার হিসার লোকসভা কেন্দ্র, বিহারের দারাউন্ডা, অন্ধ্রের বংশওয়াডা এবং মহারাষ্ট্রের খড়গওয়াস্‌লা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটাতেই কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। এদের মধ্যে শুধু বিহারেই কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল না। সেই কারণেই বলা যায়— অন্য তিনটে রাজ্যেও শাসকদলের এই লজ্জাকর বিপর্যয় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার।

হিসারের আসনটাতে জনহিত কংগ্রেস-বিজেপি জোটের প্রার্থী কুলদীপ বিষ্ণোই বিপুল ভোটে জিতেছেন। তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভজনলালের পুত্র। তাঁর মতে, তাঁর পিতৃদেব এই রাজ্যের জন্য অনেক কিছু করেছেন, এই ভোটে তার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এর পেছনে জাঠ ও অ-জাঠ গোষ্ঠীর জাতপাতগত পুরোনো দ্বন্দ্বটাও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। এই রাজ্যে অন্তত ২১ শতাংশ জাঠ ভোট রয়েছে সেটা সাধারণত কংগ্রেসের দিকেই যায়। তার ফলে জনহিত কংগ্রেস-বিজেপি জোট অন্য পক্ষের ভোটকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছে।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এবার আন্না-ফ্যাক্টরও ভোটে বেশ কাজ করেছে। প্রথম থেকেই কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচারকে আশ্রয় করেছিল— সেটা তুঙ্গে উঠেছে সাম্প্রতিককালে। লোকপাল বিল নিয়ে তার ছলাকলা, আন্না-রামদেব প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের হেনস্থার চেষ্টা, দুর্নীতি-রোধের বদলে কেজরীওয়াল, প্রশান্তভূষণ প্রমুখের বিরুদ্ধাচরণ, বিদেশী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত দেশের কালো টাকা উদ্ধারে গড়িমসি প্রভৃতি ব্যাপারগুলো যে সাধারণ মানুষ ভাল চোখে দেখেননি, এই ভোটেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের এই বিপর্যয়কে লোকপালের পক্ষে মানুষের রায় হিসেবে ধরে নিয়েছেন অরবিন্দ কেজরীওয়াল। তিনি বলেছেন, এবার নিশ্চয় কেন্দ্রীয় সরকার পার্লামেন্টে লোকপাল বিল তুলবে সংশোধিত আকারে। টিম-আন্নার আরেক সহযোগী কিরণ বেদী মন্তব্য করেছেন— কুলদীপ বিষ্ণোই ভোট-প্রচারে বলেছিলেন যে, তিনি জয়লাভ করলে লোকপালের ব্যাপারে লোকসভায় সরব হবেন, অবশ্যই ভোটাররা তাঁকে সেই কারণে সুযোগ দিয়েছে।

ভজনলালের প্রভাব, জাতপাতের লড়াই এবং লোকপাল-ইস্যু— কোন্‌টা এক্ষেত্রে বেশি প্রভাব ফেলেছে, সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে, সব মিলিয়ে এবার কিন্তু কংগ্রেসকে ভোটাররা পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্যই তার অন্যতম কারণ দুর্নীতি-পোষণ। সেইসঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, বিজেপি-র জোট গঠন এবং অ-জাঠ ভোটের একত্রীকরণও ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কংগ্রেস হেরেছে বিহারের দায়াউন্ডা বিধানসভা কেন্দ্রেও। জে ডি ইউ প্রার্থী কবিতা সিং জয়লাভ করেছেন ২০,০৯২ ভোটে। আর জে ডি-এল জে পি সমর্থিত ও কংগ্রেস-প্রার্থীরা ধুয়েমুছে গেছেন, কংগ্রেসের স্থান জুটেছে শেষ পঙ্‌ক্তিতে তৃতীয় স্থানে।

অন্ধ্রের বংশওয়াড়া আসনে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রার্থী পি শ্রীনিবাস রেড্ডী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রায় ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। কেন্দ্রে ও অন্ধ্রে কংগ্রেস-শাসন থাকলেও পৃথক তেলেঙ্গানার দাবিতে কিন্তু অন্ধ্রে তীব্র কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া বইছে। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রার্থী শ্রী রেড্ডী সেই হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে বিপুল ভোটে পরাজিত করেছেন তাঁর কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এটা মানুষের কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করারই ইঙ্গিতবহুল করছে। এক্ষেত্রে আন্নার প্রভাব কতটা পড়েছে, জানি না। অবশ্যই সারা দেশে দুর্নীতির ব্যাপারে একটা কংগ্রেস-বিরোধিতার ভাব-বন্যা বইছে এখন, সেটা নিশ্চয় বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলেছে এক্ষেত্রেও। কিন্তু সম্ভবত পৃথক তেলেঙ্গানার বিষয়টা আরও বেশি ছায়া ফেলেছে এবারের ভোটারদের মনে। শ্রী রেড্ডীর জয় তেলেঙ্গানা-আন্দোলনকে আরও জোরদার করল বলেই মনে হয়।

মহারাষ্ট্রের খড়গওয়াস্‌লা বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনের পরাজিত হয়েছে কংগ্রেস-এন. সি. পি. জোট। বিজেপি, শিবসেনা ও আর পি আই সমর্থিত প্রার্থী ভীমরাও টাপ্‌কি ৪০০০ ভোটে এখানে জয়ী হয়েছেন। অবশ্যই ব্যবধানের অঙ্কটা বড় নয়— কিন্তু আসনটা গেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের কাছে, কংগ্রেসের লজ্জা এখানেই বেশি।

একের পর এক হার নিশ্চয় কংগ্রেসের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। জনমানস থেকে কংগ্রেস যে ধুয়েমুছে গেছে সামগ্রিকভাবে—একথা এখনই বলা যায় না। কিন্তু একই সময়, চারটে উপ-নির্বাচন হলো এবং সব গুলোতেই তার বিপর্যয় ঘটল— এই ঘটনাটা কি নেতাদের মানলে অশনি-সংকেত বয়ে আনছে না? দলের নেতৃত্ব এই নিয়ে তেমন কিছু না বললেও তাঁরা যেভাবে রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিয়েছেন, তাতে তার দুর্বলতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস মুখপাত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেছেন— দলের বিপর্যয়ের কারণ তাঁরা খতিয়ে দেখছেন, বিচার-বিশ্লেষণের পর সেটা নিয়ে কথা বলবেন।

ভেতরের খবর হলো— হরিয়ানার হিসারের ফল নাকি প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু নেতৃত্ব মেনে নিতে পারছেন না পুণের খড়গওয়াসলা বিধানসভার বিপর্যয়ের ব্যাপারটা। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস ও শরদ পাওয়ারের এন সি পি-র মধ্যে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগও তুলেছে।

কংগ্রেস চিন্তায় পড়ে গিয়েছে কিছু আঞ্চলিক দলের সাফল্য নিয়েও। জনহিত-কংগ্রেস, আর পি আই, রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রভৃতি দল এবার জোট গঠন করে বেশ সাফল্য পেয়েছে। হঠে যেতে হয়েছে সর্ব-ভারতীয় দল কংগ্রেসকে।

আসলে, কংগ্রেস কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পাচ্ছে না। হিসারে অবশ্য আগেও তার পরাজয় ঘটেছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রে হারের কারণ মনে হয় তার অজানা। এখানে খড়গওয়াস্‌লা বিধানসভা কেন্দ্র পড়েছে খোদ এন সি পি প্রধান শরদ পাওয়ারের কন্যা সুপ্রিয়া সুলের লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে। তাহলে এই বিপর্যয় কেন? অন্ধ্রের অবস্থা ভাবুন। প্রায় ১ লাখ ২৬ হাজার ভোটের মধ্যে ৮৩ হাজারেরও বেশি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রার্থী— ব্যবধান প্রায় চল্লিশ হাজার। বিধানসভার ক্ষেত্রে এটা কম নয়।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকেও। তিনি অবশ্য তারস্বরে আন্নার প্রভাবের কথা অস্বীকার করেছেন, কংগ্রেসের নীতি বা কাজকর্ম নিয়ে অসন্তোষের কথাও উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনও একটা উপনির্বাচনের হার সামগ্রিকভাবে সরকারের কাজের প্রতিফলন হতে পারে না।

কিন্তু মনে রাখতে হবে— একই সঙ্গে চারটে নির্বাচনেই সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটেছে। বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলে, তার ফলে ভোটের ব্যাপারটা ভিন্নধর্মী হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের শাসনাধীন তিনটে রাজ্যেই তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে। বিহারেও ঘটেছে বিপর্যয়। এর পেছনে নানা কারণ আছে ঠিকই, কিন্তু মূল কারণ যে তার দুর্নীতির দরুণ জন-বিরূপতা— এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

মালদার শান্তিপূর্ণ এলাকাতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে

সংবাদদাতা : মালদা॥ মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার যদুপুর ১ এবং ২নং অঞ্চলের মহারাজপুর কাঞ্চনতার গ্রামে গত দুর্গা পূজার আগে এক হিন্দু যুবক এবং মুসলমান যুবতীর মধ্যে প্রণয়ের ঘটনার জেরে হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা, ধর্ষণের মামলা এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্যকে জেল হাজতে পাঠানোর ঘটনায় এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। এরপর দুষ্কৃতিরা যুবকটির পিতাকে প্রচণ্ড মারধর করে হাসপাতালে পাঠায়। এর পরবর্তীতে দশমীর পরের দিন প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে কাঞ্চনতার গ্রামের মসজিদে মুসলমানরা নির্বিঘ্নে নমাজ পড়লেও রটানো হয় যে তারা নমাজ পড়তে পারেনি। পুলিশের উপস্থিতিতে তারা নিরাপদে মহারাজপুর গ্রামে ফিরে গিয়ে একজন হিন্দুর ছেলেকে মারধর করে। এর ফলে উত্তেজনা ছড়ায়। এখানে উল্লেখ্য, কাঞ্চনতার গ্রামে কোনও মুসলমান না থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানরা নমাজ পড়ে আসছে এবং এতদিন কোনও

মুসলমান তোষণের পরিণাম

গণ্ডগোল হয়নি। ওইদিন দুপুরে মহারাজপুর গ্রাম থেকে এক ঘণ্টা ধরে বোমা ও আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার হয়। পুলিশ পরিস্থিতির সামাল দেয়। কিন্তু গুজবে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়। শেষে র‍্যাফ নেমে মহারাজপুর গ্রাম থেকে আগ্নেয় অস্ত্র ও বোমাসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করে। দুই পক্ষের লোকেদের গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। একটি স্থানে বোমা লুকানো ছিল। তাতে আগুন লাগলে সেটি ফাটতে থাকে। এই ঘটনার পর গত ৯ অক্টোবর বি ডি ও অফিসে এক সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডাকা হয়। সেখানে সকলেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানায় এবং কাঞ্চনতারের মতো শান্তিপূর্ণ এলাকাতে এভাবে গোলযোগ বাধানোর জন্য যারা দায়ী তাদের মোকাবিলার জন্য সকলকে উদ্যোগ নিতে বলেন।

শেষে গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হয় যার মাধ্যমে এলাকা যাতে শান্ত থাকে তার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

মালদার পুজো নিয়ে প্রশাসনের বৈষম্যে মানুষের ক্ষোভ

সংবাদদাতা : মালদা॥ এবার মালদা শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটি ও ক্লাবগুলির উদ্যোক্তরা প্রশাসনের কড়াকড়ি ও প্যান্ডেলে মাইক সমেত অন্যান্য খরচ বেঁধে দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য মাইক ব্যবহারের জন্য ৫৫০.০০ টাকা কর ধার্য করা অন্যায়। তাছাড়া ক্লাবের সভ্যদের নাম থানাতে জমা দিতে হবে বলে যে নিয়ম করা হয়েছে তাতে তাঁরা অপমানিত বোধ করছেন। কেননা কোনও ভদ্রঘরের সন্তানের নাম থানাতে যাক এটা অভিভাবকরা পছন্দ করেন না। কোনও দুষ্টচক্র ক্লাবের নাম করে জোর করে চাঁদা উঠিয়ে নিলে নির্দোষ সদস্যদের হয়রান হতে হবে বলে দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোক্তারা মনে করছেন। গৌড় রোড উদয়ন ক্লাবের সভাপতি প্রণব ভট্টাচার্য প্রশাসনের এইসব কাজের প্রতি একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এইভাবে প্রশাসন কড়াকড়ি করলে হয়তো পূজা উঠিয়ে দিতে হবে। ক্লাবের কোনও সদস্য সামান্য কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকলে প্রশাসন থেকে চাপ আসছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার। কিন্তু শহরে এমন কিছু কেষ্টবিষ্টুদের পূজা কমিটি রয়েছে যেখানে প্রশাসন বিন্দুমাত্র নাক গলাতে পারে না। তাঁর কথায় সবার জন্য এই ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। মাইক আস্তে আস্তে বাজানোর জন্য ডেসিমেল বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অথচ আর এক সম্প্রদায়ের মাইক প্রতিদিন উচ্চস্বরে বাজছে। তার বেলায় প্রশাসন উদাসীন কেন? বলে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

সবার উপরে দিদি সত্য তাহার উপরে নাই

মাননীয় অমিত মিত্র
অর্থমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
স্যার,

আপনাকে 'স্যার' সম্বোধন করলাম কারণ আপনি নিজে সকলকে 'স্যার' বলে ডাকতে ভালোবাসেন। তাছাড়া আপনি অনেক অর্থনীতিবিদদের মাস্টারমশাই। আপনি তো শিল্পপতিদের সংগঠন ফিকিরও কর্তা ছিলেন। কিন্তু আপনি হঠাৎ 'বোবা কালা' হয়ে গেলেন কেন?

ক'দিন আগে আপনাকে একজন সাংবাদিক রাজ্য সরকারি বেতনভুক অবসরপ্রাপ্তরা কেন পেনশন পাচ্ছেন না এ ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনি মুখে বরাবরের হাসি বজায় রেখে বললেন 'ফিনান্স মিনিস্টার ডেফ অ্যান্ড ডাম'। মূক ও বধির। কিন্তু কেন?

কোষাগারে টাকা নেই বলে? নাকি আপনাকে কথা শুনতে বা বলতেই মানা করে দিয়েছেন আপনার নেত্রী, আমাদের সবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?

রাজ্যের অন্যান্য বাসিন্দার মতো সত্যিই বুঝতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড় থেকে জঙ্গল, জঙ্গল থেকে সাগর সব জায়গায় উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন। মঞ্চ কাঁপিয়ে হাততালি কুড়োচ্ছেন। সেই সময় আপনার মুখ কান বন্ধ থাকলে চলবে কী করে?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন ধরেই রাজনীতি করছেন। অনেক বারই বামেদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলার মতো অবস্থায় গিয়েছেন। কিন্তু তখন তাঁর পাশে ছিল কিছু কংগ্রেস ভেঙে আসা রাজনীতিক। সব বিষয়ে রাজনীতিকদের ওপর আস্থা রাখা গেলেও অর্থনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি মানুষ। কিন্তু এবার ভোটের আগে আপনার মতো গুণীজনকে মমতা সঙ্গী হতে দেখেই তো বাংলা তৃণমূল সরকারের ওপর অর্থনৈতিক ভরসা করেছে। কিন্তু সরকারের ছ'মাস হওয়ার আগেই আপনি এভাবে মুখে কুলুপ, কানে তুলো দিলে আমরা কোথায় যাব? কে বলবে আমাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ কী? রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত বহু শিক্ষক পেনশন পাচ্ছেন না। পরিবহণ দফতরের পেনশন প্রাপকদের পেনশন বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় বার্ধক্য ভাতাও বন্ধ। অবস্থা দেখেও সরকার মূক ও বধির। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য কারও কথা না শুনে, কোষাগারের কথা না ভেবে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন। কিন্তু আপনিও কথা না বললে কী করে হবে? দার্জিলিংকে সুউৎজারল্যান্ড, দীঘাকে গোয়া, কলকাতাকে লন্ডন বানানোর ঘোষণা তো পুরনো হয়ে গেছে। এখন আবার সুন্দরবনেও আফ্রিকান সাফারি করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আপনিও তো এইসব ঘোষণার সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, সব হবে, সব হবে। আমরা জানতাম ফিকির প্রাক্তন কর্তা তথা তুখোড় অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি রাজ্যের হাঁড়ির হাল ভালোই জানেন। কিন্তু তাও আশা ছিল আপনি নিশ্চয়ই আপনার ঝুলি থেকে একটা জাদুদণ্ড বার করবেন। কিন্তু কোথায় কি? শপথ নিয়ে ওই মাঝরাতেই জানালেন, অনেক দেনা, টাকা চাই টাকা। আর এখন বলছেন, কিছু শুনবেনও না, কিছু বলবেনও না। তাহলে আমরা কোথায় যাই?

স্যার, এখন নিশ্চয়ই বলবেন যে, কেন্দ্র টাকা দেবে বলেছিল কিন্তু দিচ্ছে না। তাহলে এত ঘোষণা করছেন কেন আপনার নেত্রী? এরপর তো নতুন করে আশা তৈরি হচ্ছে। আর না পেলে তো নতুন করে বঞ্চনার জন্ম নেবে। সামলাবে কে? রাগ করবেন না স্যার, আসলে খুব চিন্তার থেকেই চিঠিতে এসব লেখা। জানি আপনিও ভালো নেই। আপনি খুবই অসহায়। আপনিও যেমনটা ভেবেছিলেন তেমন সম্মান পাচ্ছেন না। স্বাধীনতা মিলছে না। অনেক সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর জানতে পারছেন। ঘনিষ্ঠ মহলে সেসব দুঃখের কথা বলেওছেন আপনি। কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না। পারবেনও না। দরকারও নেই। তাহলে ঘরে ঝগড়া লেগে যাবে। এমনিতেই নিজেকে মূক ও বধির বলার পর দিদিমণি আপনার ওপর ক্ষুব্ধ। হবেই তো! আপনি তো রাজনীতিতে নতুন। তৃণমূল রাজনীতির মূল কথাই হচ্ছে, 'সবার ওপরে দিদি সত্য তাহার উপরে নাই।' একবার যখন ঢুকে পড়েছেন তখন মানিয়ে নিতেই হবে। কী আর করবেন স্যার?

স্যার, আপনারা গত পাঁচ মাস ধরে বলে আসছেন, কেন্দ্র টাকা দেবে আর আপনারা উন্নয়ন করবেন। কিন্তু সেই টাকার দেখা নাই। ফলে উন্নয়নেরও দেখা নাই। কিন্তু কতদিন আর সাধারণ মানুষ এই শুকনো কথায় শান্ত থাকবে বলতে পারেন? রাজ্যের ভাঁড়ারে কয়লা বাড়ন্ত। ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ডস সহ বিভিন্ন সংস্থা বলে দিয়েছে, আগে টাকা দাও, পরে কয়লা নাও। বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু টাকা দিয়ে আপাতত কাজ মেটানো গেছে। কিন্তু বেশিদিন কি এভাবে ঠেকিয়ে রাখা যাবে? কিন্তু তাবলে যে আপনি বিদ্যুৎ মাশুল বাড়াবেন তারও তো উপায় নেই। কারণ, সরকারের আয় বাড়ানোর মতো অজনপ্রিয় কাজ করবেন না আপনার নেত্রী। আপনি সেকথা মন্ত্রিসভার বৈঠকে তুললে থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। যদিও আপনি এতদিনে জেনে গেছেন যে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে এরাজ্যে একজনই বক্তা, বাকি সকলেই শ্রোতা। সে অর্থনীতি হোক কিংবা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমাদের অলরাউন্ডার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনার মতো পণ্ডিতদের ডিগ্রির রাজনৈতিক মূল্য থাকলেও বাস্তবিক মূল্য নেই। জানি এসব দেখে বুঝেই আপনি মৌনী নিতে চাইছেন। কিন্তু সেটা হলে আমরা কোথায় যাই?

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

গোখলে ও পশ্চিমবঙ্গ

উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষা ও নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও কর্মধারায় গৌরবান্বিত হয়ে মহামতি গোখেল মন্তব্য করেছিলেন—What Bengal thinks today, India will think tomorrow। আজ স্বাধীনতার ৬৫ তম বর্ষে মনে হয় What Bengal think today, nobody cares। 'সেই বাংলা' থেকে আজকের 'হায় বাংলায়' উত্তরণ পর্বে গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে রক্তধারা বয়ে গিয়েছিল। সে ইতিহাস বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়ে বাঙালী অনেক আগেই 'আত্মঘাতী' হয়ে ডোডো পাখি হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

স্বাধীনতাপূর্ব বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) কালে বাঙালির জাতীয়তাবাদী মেরুদণ্ড ভাঙ্গার যে চক্রান্ত বৃটিশ কর্তৃক হয়েছিল, সেই চক্রান্তের ব্যাটন ত্রিশ-চল্লিশের দশকে লীগের হাতে চলে গিয়েছিল। এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও দেশভাগ। তখন যে প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে উঠেছিল তা হিন্দু বাঙালির ভবিষ্যৎ কি হবে? কেননা, তখন জিন্না, বৃটিশ, কম্যুনিস্ট বা নেহেরু কারোরই বাংলা বৃহত্তর পাকিস্তানের মধ্যে গেলে আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। আবার ১৯৪৬-এর দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দি শরৎ বসু বা কিরণশঙ্কর রায়ের স্বাধীন সার্বভৌম সংযুক্ত বাংলার মসনদের হাতছানি ছিল জিন্নার বাণী আপত্তিতে।

সেদিনের সেই প্রচেষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অভীমন্ত্র দীক্ষিত বাঙালী মনীষীরা প্রতিহত করে। 'পাকিস্তান ভাগ' না করলে আজকের বাঙালির (হিন্দু) স্থান হোত কোথায়? বর্তমান বাংলাদেশকে দেখলেই উত্তর পাবেন। সেদিন ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কে না ছিলেন? ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার, ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক ডঃ মাখনলাল রায়চৌধুরী (আমার ছোট ঠাকুর দাদা) প্রমুখ (বাঙালির পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ : ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ)। সেদিনের সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গই আজকে আমাদের রাজ্য।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ ডান-বামের হাতে প্রাণ নিষ্পেষিত হয়ে এসেছে। যে উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল সেই স্বপ্ন-ভোটের রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট এবং আজ দার্জিলিং-আসানসোল-মালদা- মুর্শিদাবাদ-২৪ পরগণার জনবিন্যাস দেখলে আঁতকে উঠতে হয়। বাংলা ভাষার সঙ্গে উর্দু-নেপালীকে প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর পরিণতি কি?

গোখেল-এর উপলব্ধি উনবিংশ শতকের বাংলায় প্রাসঙ্গিক হলেও, আজকের পূর্বে ও পশ্চিম বাংলার চিন্তা দেখে কেউ গ্রাহ্য করে বলে মনে হয় না। তাই একটা অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করে সকলে কাজ করুক— তবেই মহামতি গোখেলের উপলব্ধি পুনরায় বাস্তবায়িত হবে।

—শিবাশিস রায়চৌধুরী, দেশবন্ধু নগর, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

ভ্রষ্টাচার ও শিক্ষক দিবস

ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতি যেভাবে সমাজ তথা দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তাতে লোকপাল আইন তাকে নির্মূল করতে পারবে এমন সম্ভাবনা বাস্তবে হবে কি? আন্নাজী তথা দেশবাসীর চাপে পড়ে বিলটি গৃহীত হলে, কিন্তু আইনে পরিণত তো জনগণ বা আন্নাজী করবেন না, করবে সেই 'চোর সাংসদরাই' যারা কালোটাকা ছড়িয়ে আমাদেরকে ঘুষ দিয়ে ভোটে জিতেছে, আমরাও একপ্রকার ঘুষখোর নই কি? তা হলে-মুক্তির উপায় কি? উপায় আমার মনে হয় সৎ শিক্ষা/আদর্শ শিক্ষাকেই যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ দেশকে 'মা' বলে জ্ঞান করবে দেশের/দশের, অকল্যাণ/ক্ষতি হবে এমন কাজ করবে না বা হতে দেখলে প্রাণ দিয়ে প্রতিবাদ করবে, শিক্ষার সেই মূল্যবোধ কোথায়, আদর্শ শিক্ষার রূপকার বিদ্যাসাগর মশাই আজ কোথায়? তাঁর জায়গা দখল করল— এক মিথ্যাচারী শিক্ষাবিদ (অ)-পবিত্র সরকার। আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে না আছে আদর্শ পাঠ্যক্রম, না আছে দেশের গৌরব গাথা-না আছে আদর্শ মনীষীদের জীবনী, কি শিক্ষা পাবে শিক্ষার্থীরা? কেবল শিখেছে ব্যভিচার। শিক্ষক ছাত্রদের মেরে জখম করছে। আর ছাত্র সমাজ শিক্ষককে প্রাণে মেরে ফেলছে। নকল করতে বাধা দিলে বা পরীক্ষায় ভাল না লেখায় কম নম্বর পেলে। সম্প্রতি একটি খবর দেখেছিলাম, কলকাতার এক নামী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা উচ্চ আদালতে মামলা করে উক্ত- বিদ্যালয়ের শিক্ষককে ওই ছেলেটিকে পাশ করাতে বাধ্য করিয়েছেন। ছেলের পিতা কি ঠিক কাজ করেছেন? এতে কি ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হবে, না মস্তান হবে?

আর দেশের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের নীতিবোধ নাই, কর্তব্যবোধও নাই, কেবল 'কামানোটাই' হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা না হলে "শপথ" অনুষ্ঠানটার কোনও মূল্য বা সার্থকতা নাই, শপথ করেই নেমে এসে বলবে আমায় সহি করতে হলে এত টাকা দিতে হবে।

—লক্ষ্মীকান্ত দাস, প্রাক্তন শিক্ষক, বারবেড়িয়া, খড়্গপুর।

কাসবের মৃত্যুদণ্ড

কাসবের মৃত্যুদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রীম কোর্ট। বিচারপতি আফতার আলম এবং সি কে প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশ দিয়ে বলেছেন, যদিও দেশের জনগণ কাসবের প্রাণ ভিক্ষার আরজি সরাসরি নাকচ করা উচিত এমন কি শোনাই উচিত নয় বলে মনে করেন, তবু ২০১০-এর ৬ মে বিশেষ জঙ্গিদমন আদালত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও হত্যার জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয় এবং ২০১১-র ২১ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট সেই দণ্ড বহাল রাখে। তাহলে আগের মৃত্যুদণ্ড কি অবৈধ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল? সুতরাং এবার এক নতুন বৈধ আইন প্রণয়ন করা হোক এবং সেই আইনে বলা হোক, বিশ্বের যে কোনও রাষ্ট্রের যে কোনও মুসলমান যে যত বড় অপরাধীই হোক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে তার কোনও শাস্তি হবে না।

টু জি কেলেঙ্কারী অপ্রত্যাশিত মোড় নিতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের ভাগ্য নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট গতকাল সোমবার শুনানির শেষে আদেশ মুলতুবি রাখল। টু জি সংক্রান্ত এক ডজন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল নজিরবিহীন ভাবে গায়েব হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে এদিন দুপুরে সুপ্রীমকোর্টে বিচারপতি বি এস সিংভি ও অশোক কুমার গাঙ্গুলীকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে স্পেকট্রাম মামলার গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে কেন্দ্রের কৌসুলি পি পি রাও এবং সি বি আই-এর কৌসুলি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলে, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ডামাডোলে পড়ে যাবে।

সুতরাং সুপ্রীমকোর্ট যেন চিদম্বরমের ভূমিকা নিয়ে সি বি আই তদন্তের নির্দেশ না দেয়! তাঁরা সর্বোচ্চ আদালতের সামনে প্রশ্ন রেখেছেন সরকারকে অস্থিরতায় ফেলাটা কি উচিত হবে?

তাহলে বোঝা গেল সরকার লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি করলেও সরকারকে অস্থির করা চলবে না। আর সি বি আই-এর কাজ দুর্নীতির তদন্ত নয় দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে রক্ষা করা।

ঈশ্বর সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং ভ্রষ্টাচার থেকে ভারতকে রক্ষা করুন।

—অম্বিকাপ্রসাদ পাল, কলকাতা-১১১।

দুর্নীতি : জাতির জীবনের ক্যানসার

অম্লান কুসুম ঘোষ

রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে ঘনকৃষ্ণ মেঘের আবির্ভাব যেমন জনমানসে ফেলে আশঙ্কার ছায়া সেরকম জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্নীতিরূপ কালো মেঘের আবির্ভাব জনগণমানসে বয়ে আনে দুর্যোগের পূর্বাভাস। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সমস্ত পথ দুর্নীতির কানাগলিতে রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের অনুরূপ অবস্থা। ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ বিলম্বে হলেও আমাদের দেশ নিয়েছে। কিন্তু সেই সঠিক পদক্ষেপসম্ভূত লাভের গুড় প্রায় পুরোটাই খেয়ে নিচ্ছে দুর্নীতি নামক পিঁপড়ে।

ভারতবর্ষের দুর্নীতিজনিত অর্থের মোট অঙ্কের দিকে চোখ ফেরানো যাক। সুইস সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সেখানকার ব্যাঙ্কগুলিতে ভারতীয়দের দ্বারা গচ্ছিত টাকার পরিমাণ দেড় লক্ষ কোটি ডলার। টাকার হিসেবে যা প্রায় ৬৮ লক্ষ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুইস ব্যাঙ্কে খোলা অ্যাকাউন্টের গ্রাহকের নাম জানানো হয় না। অতএব মনে করা যায়, ভারতের উন্নত ব্যাঙ্কব্যবস্থায় টাকা না রেখে যারা গোপনীয়তার সুযোগ নেওয়ার জন্য সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন তাদের সে টাকা কালো টাকা। অতএব বলা যায় সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের দ্বারা গচ্ছিত দেড় লক্ষ কোটি ডলার পুরোটাই কালো টাকা। পাশাপাশি অন্য দেশগুলির দিকে চোখ ফেরানো যাক। সুইস ব্যাঙ্কগুলিতে রাশিয়ার মোট গচ্ছিত অর্থ ৪৭ হাজার কোটি ডলার, ইংলন্ডের ৩৯ হাজার কোটি ডলার ও চিনের ৯৬০০ কোটি ডলার। ভারতের মোট গচ্ছিত অর্থের তুলনায় যেগুলি অনেক কম। সুইস সরকারের কাছ থেকে আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে যে সেখানকার ব্যাঙ্কগুলিতে ভারতীয়দের গচ্ছিত মোট অর্থ অন্য সবদেশের মোট অর্থের যোগফলের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশ ভারতের কালো টাকার পরিমাণ উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি। এই একটি বিষয়ে ভারত তাদের ছাপিয়ে গেছে অনেকদূর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী অন্যান্য দেশে এবং ভারতের মধ্যে নগদ টাকা হিসেবে ও অন্যান্য সম্পদ হিসেবে আরও কালো টাকা সঞ্চিত আছে যার পরিমাণ প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতের মোট কালো টাকার পরিমাণ প্রায় ৭২ লক্ষ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ভারতের মোট জাতীয় আয় তিরিশ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছিল বারো লক্ষ কোটি টাকার। অর্থাৎ মোট কালো টাকা সমগ্র ভারতবাসীর আড়াই বছরের উপার্জনের সমান এবং সেই অর্থে ছ'বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা যেতে পারে।

এবার দেখা যাক দুর্নীতির কবলে পড়া এই বিপুল অর্থ সঠিক পথে ব্যবহৃত হলে ভারতীয় অর্থনীতিতে কি কি পরিবর্তন সূচিত হোত। যে কোনও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে পরিকাঠামো। পরিকাঠামোর মূল ভিত্তি হচ্ছে যোগাযোগ-ব্যবস্থা। অর্থাৎ যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি হলে গোটা দেশের অর্থনীতির-ই উন্নতি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রক ও রেলমন্ত্রকের দেওয়া পরিকল্পনা পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা দেশের প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে পিচরাস্তা ও রেললাইন বিস্তার করতে যথাক্রমে ১৭ লক্ষ কোটি ও ২১ লক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজন। ওই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা সরকারের হাতে থাকলে এই দুটি পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হতে পারত। ওই কালো টাকা যদি সরকারের হাতে না থেকে সাদা টাকা হিসেবে বেসরকারি মালিকানায় থাকত তাহলেও সেই টাকা ভারতীয় অর্থনীতিতে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থনীতির Big Push থিওরির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে একটা বড় পরিবর্তন আনতে পারত।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়াও যে কোনও সভ্যদেশের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে, সেই দায়বদ্ধতাগুলি পালন করতেও এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বড় ভূমিকা নিতে পারত। ২০১১ সালের জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা দু'কোটি কুড়ি লক্ষের মতো, যার মধ্যে এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষের মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এই ব্যক্তিদের মাসে দু'হাজার টাকা করে প্রতিবন্ধী-ভাতা দিলে বছরে খরচ পড়বে বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকা, যা মোটা কালোটাকার ১ শতাংশেরও কম। জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট শিক্ষিত বেকার সংখ্যা সাত কোটির কিছু বেশি। সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতা অনুযায়ী প্রত্যেককে মাসে দু' হাজার টাকা করে বেকারভাতা দিলে বছরে খরচ পড়ে একলক্ষ আটষট্টি হাজার কোটি টাকা, যা মোট কালো টাকার ২.৫ শতাংশের মতো। ভারতে মোটা বি পি এল জনসংখ্যা তিরিশ কোটির কাছাকাছি। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে এদের ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করার সুযোগ দিতে বছরে খরচ পড়ে এক লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকার মতো, যা মোট কালোটাকার তিন শতাংশের কিছু কম। অর্থাৎ এই পর্বতপ্রমাণ কালোটাকার খুব সামান্য অংশ ব্যয় করেই আমাদের রাষ্ট্র তার সামাজিক দায়বদ্ধতা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন জাতির ভবিষ্যৎ-ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। ২০১১-১২ সালের বাজেট অনুসারে ভারতে মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে ব্যয় ধার্য হয়েছিল এক লক্ষ বারো হাজার কোটি টাকা। যোজনা কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়নের সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বার্ষিক প্রয়োজন তিন লক্ষ ছ'হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ বাড়তি অর্থ দরকার বছরে এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার কোটি টাকা যা মোট কালোটাকার তিন শতাংশের কাছাকাছি। অর্থাৎ দুর্নীতি নামক রাহুগ্রাস থেকে সেই বিশাল অর্থকে উদ্ধার করতে পারলে তার অতি সামান্য অংশেই আমরা মানবসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো।

এছাড়া সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী আরও বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন কৃষিক্ষেত্র, চিকিৎসাক্ষেত্র, কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে এই অর্থ কাজে লাগানো যেত। এই সবকটি ক্ষেত্রই দেশের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাভাবে এসবক্ষেত্রে আমরা অন্যদেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি।

দেহের কিছু কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধিকে বলা হয় ক্যানসার। এর ফলে দেহের অন্যান্য কোষসমূহের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়, ফলে দেহের মৃত্যু ঘটে। ভারতবর্ষের কালোটাকাজনিত সমস্যাকে ক্যানসারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কালো টাকা রূপে কিছু লোকের সম্পদের অত্যধিক বৃদ্ধি হচ্ছে যা দেশের স্বাভাবিক ও একান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মকে ব্যাহত করছে। আশঙ্কার কথা জাতির জীবনের এই ক্যানসার সম্পর্কে নাগরিক সমাজ উদাসীন, জনপ্রতিনিধিসমাজ জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রাভিভূত, ছাত্রসমাজ বীতস্পৃহ। এভাবে চললে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে যে শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

।। পর্ব — ৪।।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

শহর চন্দ্রকোণার (পশ্চিম মেদিনীপুর) 'অযোধ্যা' পল্লীর 'রঘুনাথবাড়ি'র মন্দিরগুলি প্রায় সবই বিধ্বস্ত— একথা আগের নিবন্ধে বলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন বা রাজ্যের তরফে এগুলি রক্ষার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। এগুলি যখন ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়, তখন আমি কলকাতার একটি সুপরিচিত সংবাদপত্রে এবং মেদিনীপুরের স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এগুলির দৈন্যদশার কথা তুলে ধরেছিলাম। সে প্রায় ১৯৮৬-৮৭ সালের কথা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুধু ওখানে গিয়ে একটা কথাই শুনেছি, যেহেতু ওগুলি বর্ধমান রাজপরিবারের সম্পত্তি, তাই কিছু করা যায়নি। তারাও নাকি এগুলির প্রতি আগ্রহী নয়। যাহোক, এই অমূল্য পুরাকীর্তিগুলি অবহেলা-অনাদরে ধ্বংস হয়ে গেল, এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

অনুরূপভাবে অদূরবর্তী মল্লেশ্বরপুরে মল্লেশ্বরের ঠাকুরবাড়িও প্রায় ধ্বংসের পথে। তবে সেখানে এখনও মল্লেশ্বর শিবের পুজোপাট হয় এবং দুর্গাপূজার সময় সেখানে ধুমধাম করে মল্লেশ্বরী মাতার পুজো হয়। তাই রঘুনাথবাড়ির মতো এই ঠাকুরবাড়ির এত শোচনীয় অবস্থা নয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ বা সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা লক্ষ করা গেল না। বর্ধমানের মহারাজা তেজশচন্দ্র এই ঠাকুরবাড়িরও সংস্কার করে নবকলেবর করেন ১৮৩১ খৃস্টাব্দে। সেকথা প্রবেশদ্বারের মুখে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যাকারে লেখা আছে :

'মল্লেশমন্দির নাট্যমন্দির প্রাচীর।
ধনগৃহপাকগৃহ সিদ্ধি পুষ্করিণীর।।
পঙ্কোদ্ধার শ্রীশ্রী স্বরূপনারায়ণ।
জপস্থান দ্বারপাল গৃহ পুনর্ব্বার।।
উজ্জ্বল করিলা মোহারাজাধিরাজেন্দ্র।
শ্রীবর্দ্ধমানাধীপ নৃপ তেজচন্দ্র।।
শকাব্দা সতর শত তিপ্যান্ন আস্মিন।

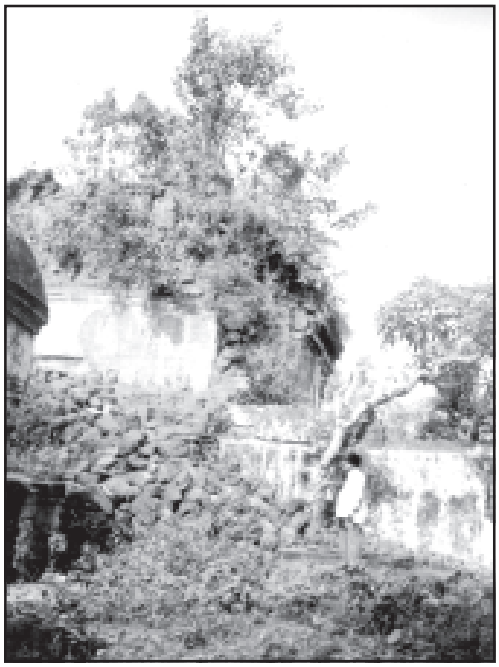

চন্দ্রকোণা শহরের রঘুনাথবাড়ির লালজীউ'র সুদৃশ্য 'আটচালা' রীতির মন্দিরের বর্তমান বিধ্বস্ত দৈন্যদশা।

ব্রহ্মপক্ষে অঙ্ক্য করে লভে শুভদিন।
সন ১২৩৮' **(বানান যেমন আছে)**

মল্লেশ্বরের মন্দিরটি 'পঞ্চরত্ন' শৈলীর। মাকড়া পাথরে (ল্যাটারাইট) তৈরি। মন্দিরের গর্ভগৃহে মল্লেশ্বর শিব নীচে থাকলেও ওপরে প্রস্তরফলকের দ্বারা আচ্ছাদিত। তাই দর্শকদের দৃষ্টিগোচর নয়। 'সিদ্ধিপুষ্করিণী' নামে একটি ছোট পুকুর মন্দির পার্শ্ববর্তী। 'জপস্থান' নামে একটি ছোট 'আটচালা', একটি 'চারচালা' বৃষভমন্দির ও ছোট একটি 'আটচালা' মনসা মন্দির বর্তমান। মল্লেশ্বর ঠাকুরবাড়ির বাইরে স্বরূপনারায়ণ ধর্মের একটি ছোট 'আটচালা' মন্দিরও আছে। মন্দিরে ধর্মের 'আসন' ও শীতলার ঘট আছে।

মল্লেশ্বর মন্দির সুদৃশ্য 'পঞ্চরত্ন' রীতির। প্রতিষ্ঠাকালের কোনও লিপি মন্দিরে নেই। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে, তাও জানা যায় না। সংস্কৃত লিপিতে 'নবসদৃশকৃতং সুসৌধত্বকার্ষীৎ'-এর অর্থ মহারাজা তেজশচন্দ্র আগের মন্দিরকে নতুনের মতো করে অতি উচ্চ সৌধ নির্মাণ করেন। তাহলে বোঝা যায়, পূর্বতন মন্দির এরূপ উচ্চ 'রত্ন'যুক্ত ছিল না। হয়তো এটি 'চারচালা' বা 'দালান' রীতির ছিল। তেজশচন্দ্র তার ওপর পাঁচটি উচ্চ 'রত্ন' বা 'শিখর' স্থাপন করেন।

জানা যায়, এই স্থানের অগে শাসক ছিলেন মল্লরাজারা। মল্লভূম-বিষ্ণুপুর থেকে তাঁরা হয়তো এসে এখানে রাজ্য স্থাপন করেন। সে 'ভান' ও তার আগে 'কেতু'-বংশেরও অনেক আগের কথা। মল্লরাজাদের কেউ হয়তো এই মল্লেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে থাকবেন। মন্দির সম্ভবত ছোটখাটো ছিল। তেজশচন্দ্র অনেক পরে এটির নব কলেবর করে 'রত্ন' সমাবেশ করেন। জনশ্রুতি, কালাপাহাড়ের অত্যাচারের ভয়ে মল্লেশ্বর শিবকে ঢেকে দেওয়া হয়। মল্লেশ্বর সেই থেকে ঢাকা অবস্থায় আছেন। মন্দিরদেওয়ালে কোনও কারুকার্য বা 'স্টাফো'র কোনও ভাস্কর্য নেই। মন্দির সুদৃশ্য, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকলেও ভঙ্গুর বা জীর্ণ নয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম

এন সি দে

উপরোক্ত পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নয়। এটির লেখক অধ্যাপক হোসেনুর রহমান। ড. চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক রহমানের লেখা পুস্তকের বিষয়টিকে সমালোচনা করে এই পুস্তকটি লিখেছেন। অধ্যাপক রহমান তাঁর পুস্তকে বেদান্ত ও ইসলাম সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সেটি একটি অপধারণা। ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকে এই অপধারণার অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেছেন।

অধ্যাপক হোসেনুর রহমান তাঁর পুস্তকে নাকি লিখেছেন বেদান্ত ধর্মের সাম্যভাব ইসলাম ধর্মে বাস্তবিকভাবে বিদ্যমান। আর বেদান্তের সঙ্গে এই সাযুজ্য প্রদর্শন করেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ইসলামের কোন্ আচারে-বিচারে এবং আচরণে স্বামীজী কিংবা রহমানজী বেদান্তের আচার-আচরণের সাযুজ্য দেখলেন, ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ''বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ইসলাম : অপধারণার অবসান'' পুস্তকটিতে সাহসের সঙ্গে এই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে, স্বামীজী বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের মধ্যে যে অদ্বৈত সাম্যভাবের উল্লেখ করেছেন, সে ভাব এলে মানুষ সবাইকে সমান দেখে, তার প্রমাণ ঈশোপনিষদের ৬ নম্বর শ্লোকটি : ''যস্তু সর্বাণি ভূতাস্যাত্মন্যেবানুপ্রশ্যতি। সর্বভূতেষু পত্মানং ততো ন বিজিগুপ্সতে।।'' অর্থাৎ যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা করে না। তাই এই বৈদান্তিক সমাজেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কিন্তু ড. চট্টোপাধ্যায় দ্বিধাহীনভাবে প্রশ্ন তুলেছেন বেদান্তের এই সাম্যের ধারণা ইসলামে বিদ্যমান আছে এর প্রমাণ কোথায়? এর প্রমাণ ইসলামী ধর্মগ্রন্থে সম্ভবত নেই। তাই লেখক নিজেই অনুমান করেছেন যে স্বামীজীর মনে এই অপধারণাটির জন্ম হয়েছিল সম্ভবত সৈয়দ আমীর আলির লেখা 'স্পিরিট অফ ইসলাম' গ্রন্থটি পড়ার পর। কারণ গ্রন্থটি ১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পর

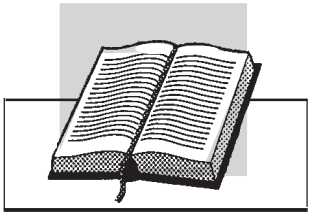

পুস্তক প্রসঙ্গ

সম্ভবত স্বামীজী এটি পড়েন এবং তার প্রতিফলন ঘটে ১৯০০ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনাতে ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে তাঁর এক ভাষণে। এই ভাষণে স্বামীজী বলেন, ''যখন একজন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, অমনি সমগ্র ইসলামী সমাজ তাহাকে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতা বলিয়া বক্ষে ধারণ করিল। এরূপ কোনও ধর্ম করে না।''

একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবীর লেখা বই ইসলাম সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণার কখনও ভিত্তি হতে পারে না। লেখক ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বামীজীর ইসলাম সম্পর্কে এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন এবং এই বিরোধিতার সপক্ষে দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি ঐতিহাসিক সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি এটা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে ''ইসলাম সম্পর্কে বিবেকানন্দের ধারণা তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে একেবারে ভ্রান্ত।''

তবে এটাও ঠিক যে বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় ইসলামে বিশ্বাসীগণ আজকের মতো অতটা আগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। সামগ্রিকভাবে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশেই ইসলাম আগ্রাসী হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ গঠন এবং পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানের অঙ্গচ্ছেদ করে এক ইসলাম রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে। মুসলিম ভ্রাতৃত্ব যে আসলে বিশ্ব- ইসলাম গঠনের লক্ষ্যে লালিত ভ্রাতৃত্ব এটা পরবর্তীকালে প্রকট হয়েছে, স্বামীজীর জীবদ্দশায় নয়। এই বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের (Pan Islamism) প্রথম প্রকাশ ঘটে স্বামীজীর মৃত্যুর অনেক পরে খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেই আন্দোলনের সময় থেকেই মুসলমানগণ বলতে থাকেন 'আমরা প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয়'। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই লিখেছিলেন, প্যান-ইসলামের চিন্তাধারাই খিলাফত প্রশ্ন সৃষ্টি করেছিল— যা ভারতীয় জাতীয়তার মূলে আঘাত করেছিল। তা যে কতটা সত্য তা সম্প্রতি প্রকাশ করে দিয়েছেন দিল্লীর জুমা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি। তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন আন্না হাজারের দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করতে। কারণ, আন্নার ও তাঁর সহযোগীদের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে 'বন্দেমাতরম' ও 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি, যা ইসলামবিরোধী। বাস্তব অবস্থা হয়তো স্বামীজীর ধারণার পক্ষে ছিল না কিন্তু মুসলিম ইতিহাসের পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, বর্বরতার ঘটনা কী তাঁর জানা ছিল না?

''বিবেকানন্দ বেদান্ত ও ইসলাম : অপধারণার অবসান''

ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, দাম ১০ টাকা।

অপরিচিত ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয়

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

মাত্র ৫৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। কিন্তু না পড়লে বিশ্বাস হয় না ছোট্ট কলেবরের এই গ্রন্থটি একটি মুক্তা খণ্ড। গ্রন্থটির নামেই গ্রন্থটির পরিচয় নিহিত আছে। আর নিহিত আছে গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। পাঠকদের পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ভারতবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া— যে ভারত সম্বন্ধে আজকের ভারতবাসী অপরিচিত; যে ভারতকে জানতে তারা অনিচ্ছুক। আরও দুঃখজনক হলো একশ্রেণীর পণ্ডিতব্যক্তি প্রাচীন ভারতকে পাঠকদের কাছে তুলে দিতে আগ্রহী নন। লেখক ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার ঠিকই বলেছেন, একটি ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে 'আদিম যুগের মানব' অধ্যায়ে চীনদেশের জন্য ৪৬টি শব্দ ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে একটি শব্দও ব্যয় করা হয়নি (পৃ: ২)।

লেখক এই ক্ষুদ্র কলেবরের গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তর যুগ থেকে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। এত ছোট গ্রন্থে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সপ্তম বছর ধরে বিবর্তিত প্রস্তর যুগ, ১ লক্ষ ২০ হাজার ধরে বিকশিত নব্যপ্রস্তর যুগ, ৮ হাজার ৫০০ বছরের প্রাচীন মেহেরগড় সভ্যতা এবং তারপর ৫৬০০ বছরের প্রাচীন হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা বর্ণনা করেছেন বা লেখকের মুন্সীয়ানাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা না করে পারা যায় না।

দীর্ঘ ২০ পৃষ্ঠা ধরে ড. সরকার মেহেরগড় সভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রাচীনতম সভ্যতার কথা বিশ্ববাসীর জানা ছিল না। জানা গেল ১৯৭৭ সালে। যার অবস্থান ছিল সিন্ধু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বালুচিস্তানের মেহেরপুরে। এই সভ্যতার যুগে দেখা যায় দেবীমূর্তির বাহুল্য যা পরবর্তী ভারতীয় সভ্যতার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই সভ্যতার ধীরে ধীরে বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয়েছিল সরস্বতী নদী তীরে সরস্বতী সভ্যতার। এই সভ্যতার উল্লেখ পাওয়া যায় ঋকবেদে। অনেক প্রাচীন রাজা সরস্বতী নদীতীরে রাজত্ব করেছেন। পৃথিবীর এক প্রাচীন রাজা ছিলেন নহুষ। গুরু জাতির লোকেরাও এই নদীতীরে বাস করতেন। অতি উন্নত ছিল তাদের সমাজজীবন।

সরস্বতী নদীর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী সভ্যতার বিনাশ হয়। উদ্ভব হয় হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার। হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা সম্বন্ধে ইতিহাসের পাঠকমাত্রই পরিচিত। কিন্তু লেখক ২০ পৃষ্ঠা জুড়ে এত তথ্য পরিবেশন করেছেন যে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। জ্ঞানের ভাণ্ডারও যায় বেড়ে।

লেখক একজন গবেষকের মতই অজস্র গ্রন্থের উল্লেখ করে তার বক্তব্য বলিষ্ঠ করেছেন। বাড়িয়ে দিয়েছেন গ্রন্থটির মাত্রা।

আরও যে কারণে বইটি পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করবে তাহল প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে হরপ্পা সভ্যতা পর্যন্ত অজস্র চিত্র।

আমরা এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি এবং লেখককে আরও তথ্য সম্বন্ধে এই জাতীয় গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করি। আমরা তাঁর আরও পাণ্ডিত্যের স্বাদ পেতে চাই।

পুরাতত্ত্বের আলোতে প্রস্তর যুগ থেকে জন্ম ভারতের সভ্যতা।
—ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার।
শ্রীগুরু প্রকাশনী,
হিজলপুকুর, হাবড়া।
মূল্য ২০ টাকা।

চারটি নাটকের সংকলন

গোপাল চক্রবর্তী

এই সংকলনে মোট চারটি নাটক স্থান পেয়েছে। প্রথম নাটক সোমনাথ বড়ালের 'কেবলি যাতনাময়'। সামাজিক বিধি নিষেধ ও সংস্কার আমাদের মজ্জাগত। যে সংস্কার প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসার উচ্ছলতাকে বারংবার ভ্রুকুটি দেখায়। এই নাটকে দুই তরুণ-তরুণী সেই ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে কিন্তু দ্বিধা কিছুতেই কাটে না। বিশেষ করে আমাদের সমাজের মেয়েরা এখনও যে সংস্কারপন্থী তা এই নাটকে প্রকট হয়ে উঠেছে। তবুও যৌবনের উচ্ছ্বাসের কাছে সংস্কার পরাভব মানে। রতন ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে সোমনাথ বড়ালের নাটকটি আঙ্গিকের দিক থেকে একটি সার্থক একাঙ্ক। চরিত্র সংখ্যা মাত্র চার। প্রেক্ষাপট এবং সংলাপ রচনায় নাট্যকার মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এই নাটক অনায়াসে একটি মঞ্চ সফল নাটক হতে পারে।

এই সংকলনের দ্বিতীয় নাটক 'অবাস্তবে বাস্তব'। স্যাটায়ারধর্মী এই নাটকে আমাদের সমাজের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে উপভোগ্য করে পরিবেশন করেছেন নাট্যকার শেখর দাশগুপ্ত। সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুত্র-পুত্রবধূদের কাছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শ্বশুর-শাশুড়ি যে কত অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত তা এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। কৌতুকের মোড়কে এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে নাট্যকার সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এই নাটকের। নাটকের দৃশ্য সংখ্যা বাইশ যা স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূল। চরিত্র সংখ্যাও কুড়ি, যা এ ধরনের নাটকের ক্ষেত্রে বাহুল্য। এই সংকলনের তৃতীয় নাটক 'ভোলারাম'। কৌতুক রসাত্মক এই নাটকে বর্তমান প্রশাসনের লোভ এবং অপদার্থতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন নাট্যকার পুলক রায়। মঞ্চস্থাপত্য সম্পর্কে নাট্যকার যথেষ্ট সচেতন, চরিত্র সংখ্যা এগারো।

সংকলনের চতুর্থ তথা শেষ নাটক 'দম্পতি'। নাট্যকার কৃষ্ণচন্দ্র দে। মোট ছাব্বিশটি দৃশ্য এবং স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে বাইশজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই নাটকে নাটকীয়তা তেমন দানা বাঁধেনি। পড়তে পড়তে মনে হয় নাট্যকার গল্প লিখতে গিয়ে ভুল করে নাটক লিখে ফেলেছেন। নাটক যে মঞ্চস্থ করতে হয়! তার জন্য যে কলাকৌশলের প্রয়োজন নাট্যকার হয়তো তা বিস্মৃত হয়েছিলেন। এই নাটকের কাহিনিটি ভাল। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন— একজন নাট্যকার পাঠকের চেয়েও দর্শক শ্রোতাদের মনের ক্ষুধা মেটাতে অধিক দায়বদ্ধ।

এই সংকলনের কাগজ ও মুদ্রণ ভাল।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাট্য সংকলন। সম্পাদনা : ইন্দ্রজিৎ পাল, অম্বিকা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। দাম : ১২৫ টাকা।

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

আয়ু মাপার পরীক্ষা

একটি রক্তপরীক্ষা, আর রিসার্চ সেন্টারে তাতেই জানা যাবে আয়ু আর কতদিন। ন্যাশনাল ক্যানসারাইন মাদ্রিদ-এর গবেষক মারিয়া ব্লাস্কো জানিয়েছেন, তিনি আয়ুর মাপার এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন, যার দ্বারা দেহকোষে অবস্থিত ক্রোমোজোম প্রান্তের (টেলোমিয়ার নামে পরিচিত) দৈর্ঘ্য জানতে সাহায্য করবে। যাঁদের টেলোমিয়াররের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকের থেকে কম, তাঁদের আয়ুও কম হবে। ব্লাস্কোর মতে, এই পরীক্ষার সাহায্যে ছোট টেলোমিয়ার অর্থাৎ কম আয়ুর কথা জানতে পারলে কোনও ব্যক্তি তাঁর জীবনযাত্রা বদলাতে পারেন।

অপরিহার্য টম্যাটো

প্রতিদিন নিয়ম করে ৫০০ মিলিলিটার টম্যাটো রস গ্রহণ করলে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমেরিকার অ্যাডিলেড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এক গবেষণায় জানা গিয়েছে, টম্যাটোতে প্রচুর পরিমাণে 'লাইকোপিন' কণা পাওয়া যায়, যার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্ষতিকারক কোলেস্টরলের পরিমাণ কমায়। ফলে রক্তচাপও বাড়তে পারে না। তবে কাঁচা টম্যাটোর বদলে রান্না করা টম্যাটোয় লাইকোপিনের গুণ বৃদ্ধি পায়।

আয় ঘুম

যাঁরা ইনসমনিয়ায় ভোগেন, ঘুমের বড়ি না খেলে ঘুম আসে না, তাঁদের জন্য একটি সুখবর। আমেরিকার পিটস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, ঘুমও হবে ভাল, এমন একটি 'নাইটক্যাপ' তৈরি করেছেন। রাত্রে নাইটক্যাপ পরে নিলেই হবে। ঘুমের বড়ি গিলে নিদ্রাদেবীর ধ্যান করতে হবে না। দু'চোখ জুড়ে নেমে আসবে ঘুম।

মানবিক রোবো-নার্স

রোবট এবার নার্সের কাজ করবে। লন্ডনের কুইনমেরি ইউনিভার্সিটির গবেষকদের দাবি, অসুস্থ ও বয়স্কদের সেবার জন্য তাঁরা এক ধরনের ইন্টার‍্যাক্টিভ রোবট তৈরি করেছেন, যেগুলি নার্সদের মতোই খুবই সংবেদনশীল হবে। বিজ্ঞানীরা এমন কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার করতে চাইছেন, যার মধ্যে মানবিক চাহিদাগুলি উপস্থিত থাকে। এই রোবটগুলি অনায়াসে বুঝে যাবে, কে কী চাইছে, কার কী প্রয়োজন। ব্যস, সেই মতো পৌঁছে যাবে রোগী বা বয়স্কদের কাছে। রয়্যাল সোসাইটির এক অনুষ্ঠানে রোবটগুলির প্রদর্শনীও হয়েছে।

উপকারী আখরোট

উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ আখরোটে আছে ওমেনা তিন ফ্যাট ও আস্‌ফা লিমোলিক অ্যাসিড। যার ফলে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীগুলিতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। ধমনীতে কোনও ব্লকেজ সম্ভাবনাও থাকে না। এছাড়া আখরোটে রয়েছে কয়েকটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, যা ক্যানসার সারাতে সাহায্য করে। রোজ আখরোট খেলে গলব্লাডারে পাথর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। লিপো প্রোটিন ও শরীরে কাজে লাগে না এমন কোলেস্টেরলকে কমিয়ে দিতে সক্ষম আখরোটের মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। আখরোটে বুদ্ধিও বাড়ে।

রঙ্গকৌতুক

খরিদ্দার : একটা প্যারাশুট দিন তো, পাহাড় থেকে ঝাঁপ মারবো।
দোকানী : এই নিন।
খরিদ্দার : সময় মতো খুলবে তো?
দোকানী : না খুললে আমি তো আছি, পাল্টে নিয়ে যাবেন!

***

মেয়ে : মা, মডেলিংয়ের জন্যে বাপীদা আমার এক কপি ছবি চেয়েছে।
মা : আগে তোর বাপীদার এক কপি ছবি থানায় জমা দিস।

***

ভাড়াটে : এমাসেও আমি ভাড়া দিতে পারছি না।
বাড়িওয়ালা : গত মাসেও তো একই কথা বলেছিলেন।
ভাড়াটে : কারণ আমি এক কথার লোক।

***

স্ত্রী : শোন, ডাক্তারবাবু বলেছেন আমার শরীরের যা অবস্থা, একমাসের জন্য চেঞ্জে যেতে বলেছে। কোথায় যাই বলতো?
স্বামী : অন্য ডাক্তারের কাছে।

***

প্রশ্ন : শহরে এত আগুন লাগে কেন?
উত্তর : আগুন লাগবে, আগুন নেভাবার চেষ্টা হবে, আগুন যাতে না লাগে তাই নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও হবে, আবার আগুন লাগবে, আবার...

***

শিক্ষক : বল্ তো অ্যাড্‌ভার্ব কাকে বলে?
ছাত্র : যে-শব্দের শেষে ly থাকে। যেমন গাঙ্গুলি, আধুলি।
শিক্ষক : বা-বা-বা-বা-বাঃ! বল্‌তো জেন্ডার ক' প্রকার?
ছাত্র : ওটা স্যার এক প্রকার, যেমন আলেকজান্ডার!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। উচ্চবংশীয়, সুদর্শন ও প্রবল পরাক্রমী এমন কেউ, যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন, তিনিই পাবেন দ্রৌপদীকে—এই ঘোষণাটি কে করেছিলেন?

২। আটত্রিশতম প্যারালাল লাইন (অক্ষরেখা) কোন্ দু'টি দেশের মধ্যে বিভাজন রেখা?

৩। জগন্নাথ, মঘাট, মাহোকা, আমবাড়ি, কারিয়েলি, বাংলা, মিঠা—এই নামগুলি কিসের?

৪। স্বাধীন ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী, পরে তিনিই হয়েছিলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি। কে তিনি?

৫। 'নকশাল' আন্দোলনের নাম পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলের নাম থেকে সৃষ্টি?

৬। রামচন্দ্রের সমুদ্র-বন্ধনের সেতু নির্মাণ করেছিলেন কে?

৭। ১৯৮০ সালে অলিম্পিকে হকিতে কোন্ দেশ সোনা জিতেছিল?

—নীলাদ্রি

উত্তর : ১। ধৃষ্টদ্যুম্ন, ২। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, ৩। নানারকম পানের, ৪। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ৫। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি, ৬। বিশ্বকর্মাপুত্র নল নামধারী বানর , ৭। ভারত

কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। —কী পড়বে, কোন্ কোর্স ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেবে, পড়বেই বা কোথায়— এসবের কিছু সুলুক সন্ধান দিয়েছেন ***নীল উপাধ্যায়।***

অকুপেশনাল থেরাপি

শারীরিক বা মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন মানুষকে সুস্থ সাধারণ জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আজকের দিনে একটা কার্যকর পদ্ধতি হলো 'অকুপেশনাল থেরাপি'। অ্যালঝাইমার, স্কিৎসোফ্রেনিয়ার মতো বিভিন্ন মানসিক রোগ থেকে শুরু করে কাজের সূত্রে আঘাত, জন্মগত সমস্যা বা মল্টিপল স্ক্লেরোসিসের মতো দুরারোগ্য রোগ— এই সব ক্ষেত্রে নিরাময়ের জন্য অকুপেশনাল থেরাপিস্টদের গুরুত্ব অপরিসীম।

'অকুপেশনাল থেরাপি' পড়তে যোগ্যতা লাগে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। কোর্সের মধ্যে অ্যানাটমি, প্যাথলজি, ফিজিওলজি, সার্জারির মতো ক্লিনিক্যাল বা প্যারামেডিক্যালের বিষয়ও পড়ানো হয়। কোর্স শেষে বিভিন্ন ক্লিনিকাল প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ছ'মাসের বাধ্যতামূলক ইনটার্নশিপ করতে হয়। ৪ বছরে স্নাতক। লাইসেন্স থেরাপিস্টদের বিভিন্ন ডিগ্রির পাশাপাশি জাতীয় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

কলকাতার National Institute for the Orthopaedically Handicapped-এ (http : // www.nioh.in/departments.html) অকুপেশনাল থেরাপিতে স্নাতক (সাড়ে ৪ বছর) এবং স্নাতকোত্তর (দু' বছর) কোর্স করানো হয়। All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation-এ (http : //www. aiipmr.gov.in/ training.html) মাস্টার্স ইন অকুপেশনাল থেরাপি এবং ডিপ্লোমা ইন রিহ্যাবিলিটেশন ফর অকুপেশনাল থেরাপিস্টস্ কোর্স রয়েছে।

কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে পড়াশুনো

অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে কোনও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অকেজো প্রত্যঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার পদ্ধতিকে বলে 'প্রস্থেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স'। কারও অঙ্গহানি হলে তাঁকে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান করার প্রক্রিয়াকে বলে প্রস্থেসিস। আর অর্থেটিকস্ হলো বিকৃত বা দুর্বল অঙ্গকে বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে অবলম্বন দেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি দু'ধরনের পদ্ধতিই কাজে লাগাতে হয়।

সাধারণত প্রস্থেটিকস্ ও অর্থোটিক্স-এর ওপর ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ সাড়ে ৪ বছর। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক ও বায়োলজি) থাকলে এই কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তবে ডিগ্রি কোর্স ছাড়া এবিষয়ে দু'বছরের ডিপ্লোমা কোর্সও করানো হয়। সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে ফিটার/টার্নার/মেসিনিস্ট বা টুল্স-এর ওপর আই টি আই-এর সার্টিফিকেট-এরও প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ কোর্সের ক্ষেত্রেই বয়ঃক্রম ১৭ থেকে ২৩। ভর্তি নেওয়া হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। এবং কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষার পর ৬ মাসের ইনটার্নশিপ করানো হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে কাজটা ঠিকঠাক শিখতে পারেন। এই পেশায় যোগ দিতে গেলে সেবা করার মানসিকতা এবং সহনশীলতা খুবই জরুরি। এই কোর্সটি করায়—

(১) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, B.T. Road Bonhooghly, Kolkata-90 (Ph. 2531-1248). (২) All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Haji Ali Park, Khadi Marg, Mumbai-400034 (Ph : 91-22-23544341/42)।

ভগিনী-নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষে আলোচনা সভা

ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও নবজীবনের প্রতিনিধি নিবেদিতা

আলোচনাচক্রে ভাষণরতা রাইকমল দাশগুপ্ত। রয়েছেন (ডান দিক থেকে) সন্ন্যাসিনী ভবানানন্দময়ী, পূরবী রায়, শম্পা মিশ্র ও অনুপা দাস।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ''যথার্থ শিক্ষিকা হয়েই নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। পুঁথিগত শিক্ষা দিতে তিনি আসেননি। শিক্ষাকে ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। আবার ধর্ম মানে স্ত্রীশক্তি বা মাতৃজাতিকে বাদ দিয়ে নয়। এটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ জীবনের আচরণে দেখিয়েছেন। জীবনকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেবা, শিক্ষা ও ধর্ম জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষা মানে শুধু ডিগ্রীলাভ করা আর অর্থ উপার্জন করা নয়। নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ এদেশের অভাব অনুভবের কথা জানিয়েই নিয়ে এসেছিলেন। নিবেদিতা ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এলেও তিনি তাঁর ছাত্রীদের মনে করিয়ে দিতেন, 'তোমাদের প্রেরণা ও আদর্শ, তোমাদের রাণী ভিক্টোরিয়া নন, তোমাদের রাণী পদ্মিনী, লক্ষ্মীবাঈ, রামায়ণ-মহাভারতের মহীয়সী নারীরা।' জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানো তাঁর শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।''

গত ২২ অক্টোবর বিকেলে মহাজাতি সদন (এ্যানেক্স) প্রেক্ষাগারে ভগিনী নিবেদিতা প্রয়াণ শতবর্ষ সমিতির আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত এই কথাগুলি বলেন। বস্তুত, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সভা আয়োজিত হয়েছিল। ভারতভগিনী নিবেদিতার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এদিন তিনজন বিশিষ্ট বক্তা অত্যন্ত মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। ডঃ রাইকমল দাশগুপ্তের বিষয় ছিল 'শিক্ষা ও নিবেদিতা'। ডঃ দাশগুপ্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, অনেকের গৈরিক রঙে আপত্তি। এটা ঠিক নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। রাণী অহল্যাবাঈ, রাণী লক্ষ্মীবাঈ আমাদের আদর্শ। স্বামীজীর কথায় ম্যান মেকিং ও ক্যারেকটার বিল্ডিং (চরিত্রগঠন) শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। নিবেদিতা সেটাই সার্থক করতে চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাকে ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন। এর অভাবে এখন অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আত্মহনন করছে, যা দেশের চরম ক্ষতি। শ্রীমতী দাশগুপ্তা মা সারদা ও নিবেদিতাকে ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও নবজীবনের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন।

ভারতীয় যাদুঘরের সেবানিবৃত্ত কর্মকর্ত্রী শ্রীমতী অনুপা দাস প্রাঞ্জল ভাষায় 'স্বাদেশিকতা ও নিবেদিতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, স্বাদেশিকতার দুটি দিক—বাহ্যিক স্বাধীনতা ও অন্তর্মুখী স্বাধীনতা। বিদেশের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের বিকাশ তথা উন্নয়ন, ত্যাগ, সেবা, বীর্য ও স্বাবলম্বন ভাবনার জাগরণ। ভারতবর্ষের নবজাগরণে নিবেদিতা কতটা সফল তা গবেষণার বিষয়। ভারতবাসী তাঁকে লোকমাতার আসনে বসিয়েছে। ত্যাগ, সেবা, দেশাত্মবোধের জাগরণ এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধাকে যুক্ত করেছেন নিবেদিতা। স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন, স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার এবং ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছেন নিবেদিতা। বজ্র-ছাপযুক্ত জাতীয় পতাকা তিনি স্বহস্তে তৈরি করেছিলেন।

নিবেদিতার জীবনের সমাজসেবা লোকসেবার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী শম্পা মিশ্র। তাঁর বক্তব্য নিবেদিতা যাই করেছেন তা সেবামূলক এবং সেবার মনোভাব নিয়েই করেছেন।

এদিন আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন নেতাজী গবেষিকা ডঃ পূরবী রায়। তাঁর ভাষণে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'নিবেদিতা'কে নিয়ে সেভাবে এদেশে চর্চা হয়নি। যা একান্ত প্রয়োজন। উদ্যোক্তাদের এজন্য তিনি সাধুবাদ জানান। সভার শুরুতেই মঞ্চস্থ সকলেই ভগিনী নিবেদিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। আলোচনার সূত্রপাত করে হৃদয়পুর প্রণবকন্যা সঙ্ঘের সন্ন্যাসিনী ভবানানন্দময়ী 'মা' নিবেদিতার জীবনী পাঠসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

আলোচনাসভা পরিচালনা করেন মৌসুমী কর্মকার এবং শেষে ধন্যবাদ জানান রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রান্তকার্যবাহিকা ঋতা চক্রবর্তী।

বুনিয়াদপুরে পরাবর্তন অনুষ্ঠান

সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর বড়াইল উপজাতি কল্যাণ আশ্রমে মহালয়ার পুণ্যলগ্নে শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে ২৬টি পরিবারের ১২১ জন সদস্য খৃস্টান থেকে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই পরাবর্তন অনুষ্ঠানে শান্তিযজ্ঞ পরিচালনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দু'জন স্বামীজী। এই পরিবারগুলি দশ বছর আগে লোভ এবং প্রলোভনে পরে খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এখন তাঁরা শুদ্ধি যজ্ঞের মাধ্যমে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে এসে খুশি হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই উপলক্ষে তাঁদের নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, শিক্ষক প্রিয়ব্রত মালাকার, সাঁওতাল সমাজের গুরুমা শ্রীমতি রেখা হেমব্রম, সমাজসেবী নরসিংহ প্রসাদ গুপ্ত, প্রান্ত সংযোজক গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু, প্রান্ত প্রমুখ বিদ্যুৎ রায়, শ্রী সরকার হেমব্রম, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সুকুমার রায়চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষক অলোক কুমার দাস ও প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দার প্রমুখ। শেষে পংক্তি ভোজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলার গাজোল ও হবিবপুর প্রভৃতি এলাকাতে এইরূপ অনেক পরিবার রয়েছেন। যাঁরা একদা লোভে পড়ে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে (সাঁওতাল) খৃস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাঁরা নিজেদের পদবী বজায় রেখে দুই ধর্মের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন।

বস্ত্রদান উৎসব

দুর্গাপুজো উপলক্ষে উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে ও সমাজসেবা ভারতীর পৃষ্ঠপোষকতায় গত ১১ সেপ্টেম্বর দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবা ভারতীর প্রান্ত সহ-সম্পাদিকা শাশ্বতী নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার, অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ১১৫ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাবড়া নগর কার্যবাহ শিবশঙ্কর দাস এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন সুবীর সাহা, সুজয় সরকার, ভাস্কর দাস প্রমুখ।

সমাবেশ সমাচার

সুন্দরবন জেলায় সঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ

প্রতিবছরের মতো এবারও গত ৮ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার জয়নগর মহকুমার অন্তর্গত জামতলা ভগবানচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে আর এস এসের সুন্দরবন জেলার প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ আয়োজিত হয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রশিক্ষণ বর্গের বিরোধিতা করায় অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বর্গ সমাপ্ত হয়। ওই রাজনৈতিক দলগুলোর মুসলমান নেতৃবৃন্দ আর এস এসের প্রশিক্ষণ বর্গ অন্যত্র স্থানান্তরকরণের জন্য সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। কিন্তু কার্যকর্তাদের অদম্য জেদ দেখে ১৬ তারিখের পরিবর্তে ১৩ তারিখের মধ্যেই প্রশিক্ষণবর্গ সমাপ্ত করার আবদার করতে থাকে সেই মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব। তাতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত বাজার কমিটি ও স্থানীয় স্কুল কমিটির সভাপতির অটল মনোভাব ও সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের কর্মকুশলতায় নির্ধারিত ১৬ অক্টোবর পর্যন্তই চলে বর্গ। এলাকার মানুষজন ও স্থানীয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও সর্বতোভাবে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন বলে সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শোক-সংবাদ

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী গৌরিকেদার ভট্টাচার্যের ষষ্ঠ সন্তান ও আবাল্য স্বয়ংসেবক বিভাস ভট্টাচার্য গত ১৭ অক্টোবর কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। সংস্কার ভারতীর দুই বিশিষ্ট কার্যকর্তা বিকাশ ভট্টাচার্য ও সুভাষ ভট্টাচার্যের অনুজ ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে নাটক ও চলচ্চিত্রের শব্দগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বর্তমান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

***

গত ১ অক্টোবর দুপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পুরুলিয়া জেলা সভাপতি আনন্দময় ভট্টাচার্য সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি সরকারি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র-পুত্রবধূ, বিবাহিত ৪ মেয়ে সহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেলেন।

সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় নাট্যমহোৎসব হয়ে গেল কলকাতায়

বিকাশ ভট্টাচার্য

গত ২৩, ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় নাট্যমহোৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শেষ হলো। দেশের ন'টি রাজ্যের মোট ১১০ জন রঙ্গকর্মী তিনদিন এক ছাদের তলায় (বিনানী ভবন) থেকে পরস্পর মত বিনিময় করার সুযোগ পেলেন। সারাদেশে এই সময়ে নাটক নিয়ে কি ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে— তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা করলেন। তিনদিনে মোট ১০টি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এরমধ্যে সংস্কৃত-কন্নড়, ওড়িয়া, নেপালী, সিন্ধি, বাংলা ও হিন্দী নাটক আছে।

২৩ তারিখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রথীন্দ্র মঞ্চে নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। তিনি বলেন, এ ধরনের বহুভাষিক নাট্যউৎসবের আজ খুব প্রয়োজন। নাটকই পারে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা তথা জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় বলেন, এই মুহূর্তে সারা ভারতের মধ্যে কলকাতাই নাট্যচর্চায় এগিয়ে আছে। কলকাতা আর নাটক— এ দুটি শব্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি নাটকের পীঠস্থান সেই কলকাতায় সবাইকে স্বাগত জানান। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রমুখ নাট্যজনদের পরিচয় করিয়ে দেন বিমল লাঠ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পূর্বাঞ্চল প্রমুখ সুভাষ ভট্টাচার্য। উৎসবের প্রথম নাটক ছিল রাজস্থানের স্বতন্ত্রতা সেনানী হেমু কালানীর জীবন নিয়ে সিন্ধি ভাষায় তাঁর আত্মবলিদানের নাটক। মঞ্চস্থ করলেন সংস্কার ভারতী বিকানীরের শিল্পীরা। ভূকম্পনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও নাটককে ভালোবেসে সুদূর গ্যাংটক থেকে নেপালী ভাষার নাটক 'প্রতিকার' নিয়ে এসেছিলেন সংস্কার ভারতী গ্যাংটকের শিল্পীরা। স্বতঃস্ফূর্ত করতালি ধ্বনিতে উপস্থিত দর্শকেরা শিল্পীদের স্বাগত জানান। প্রথমদিনের সবশেষ নাটক ছিল মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন প্রান্তের হিন্দী নাটক 'ভোর কি তারা'। নাটকটি ঐতিহাসিক।

সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত বিভাস চক্রবর্তী। রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) বিকাশ ভট্টাচার্য, বিমল লাঠ, সুভাষ ভট্টাচার্য ও নীলাঞ্জনা রায়।

মহারাষ্ট্রের নাটক 'ভোর কি তারা'র একটি দৃশ্য।

দ্বিতীয় দিন লোকনাট্যের ঢং-এ সংস্কার ভারতী গোরখপুরের শিল্পীরা পরিবেশন করেন তাঁদের হিন্দী নাটক 'কথা এক আজনবী লাশ কা'। দলগত অভিনয়ে এ নাটক প্রথম থেকেই জমে যায়। সেই তুলনায় সংস্কার ভারতী রুরকীর একল অভিনয় 'হাসিয়া' তেমন দানা বাঁধেনি। সবশেষে ছিল সংস্কার ভারতী ব্যাঙ্গালোরের বর্ণাঢ্য ঐতিহাসিক নাটক 'ভারত জননীয়া তানুজাতে'। কর্ণাটকের পাঁচ মহাপুরুষের জাতীয় জীবনে অবদানের কথা কোলাজের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রঙ্গীন পোষাক, মঞ্চসজ্জা সর্বোপরি অভিনয় এ নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে।

শেষ দিনের অনুষ্ঠান ছিল গিরিশ মঞ্চে। ওড়িশার শোনপুর থেকে আগত শিল্পীরা তাঁদের ওড়িয়া নাটক 'সৃষ্টি' নিবেদন করলেন। একজন সৃজনশীল শিল্পীর মর্মবেদনা এ নাটকে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। সংস্কার ভারতী রাঁচীর শিল্পীরা পরপর দু'টি একক অভিনয় করলেন। 'জোকার কা দিল' ও রেপারটরি কলকাতার বাংলা নাটক 'ঠিকানা ভারতবর্ষ'। এক নবীন ডাক্তার দিশার উত্তরবঙ্গের সুদূর গ্রামে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজের অভিজ্ঞতা— বিশেষ করে অসুবিধার মধ্যে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এ নাটকে। প্রতিদিন নাটক শেষে প্রতি নাটকের পরিচালককে উৎসব স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

শব্দরূপ-৬০০ বৈশালী রায়চৌধুরি

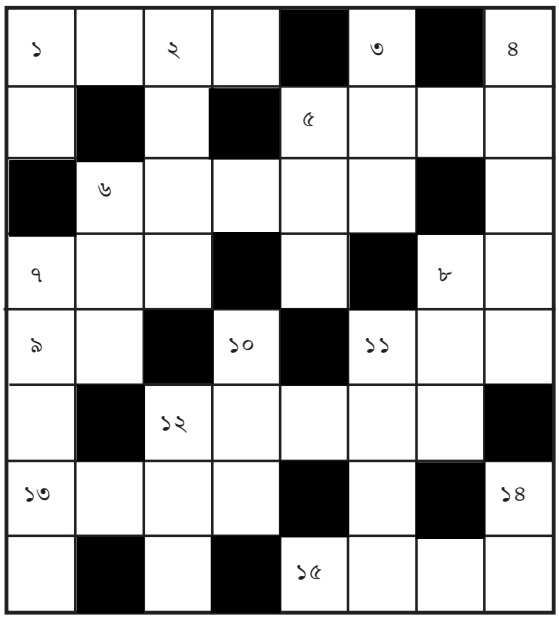

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পরীক্ষিতের স্ত্রী ও জনমেজয়ের জননী, মধ্যে বিশেষণে গলিত, **৫.** একপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থ, **৬.** প্রথম তিনে হাজার সংখ্যা, শেষ দুয়ে কিরণ আসলে সূর্যের এক নাম, **৭.** প্রতিশব্দে মেঘ, **৮.** গ্রন্থি, গাঁট, **৯.** শক্তি, **১১.** বড় চিংড়িমাছ বিশেষ, **১২.** লাল চন্দনের ফোঁটা বা ছাপ, শেষ দুয়ে ইঙ্গ তালা, **১৩.** বৈদিক ঋষি বিশেষ, দুয়ে-চারে শবদাহের চুল্লি, **১৫.** অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুনের ছদ্মনাম।

উপর-নীচ : ১. এরই সঙ্গে উচ্চারিত শব্দ, মমতা, **২.** আলংকারিক অর্থে প্রচণ্ড আঘাতে বিমূঢ়, শেষ দুয়ে বিশেষণে হত্যা করা, **৩.** সচরাচর কাব্যের সমুদ্র, **৪.** মধুরভাষী নারী, **৫.** গাছের ছাল, **৬.** কারণসহ, সম্পূর্ণ, শেষ দু'য়ে শিকড়, **৭.** বনলতা সেন, রূপসী বাংলা এই কবির কাব্যগ্রন্থে, **৮.** পাখির ডানা, **১০.** শূন্যতা, **১১.** গলায় অনভিপ্রেত বোঝা, **১২.** আকাশে উড়াবার আতশবাজি বিশেষ, **১৪.** কলাগাছ দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরি তরী বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুনীল কুমার বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম

					দ	ক্ষ	তা
	জ	হ	র		গু		ড়
মা			জ	ন	ক		কা
থা	ন	কু	নি				রা
র				শু	ক্ল	প	ক্ষ
ঠা		ক	র	ভ			সী
কু		ম্প		দ	ং	শ	
র	ণ	ন					

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬০০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়